ভারতবর্ষ ও মার্ক্‌স্‌বাদ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"আজ ও আগামীকাল" সিরিজ

সমবায় পাবলিশার্স
কলিকাতা

১৯৪৫

ভূমিকা

এই বই-এর প্রবন্ধগুলির প্রায় প্রত্যেকটী কোন-না-কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। এগুলির মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে, তা সহজেই পাঠকের চোখে পড়বে আশা করি। মার্ক্‌স্‌বাদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে চক্ষু উন্মীলিত না হলে সমাজের ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা যে দূর হতে পারে না, তা ক্রমেই অনেকে বুঝ্‌ছেন। মার্ক্‌স্‌বাদ আয়ত্ত করার যোগ্যতা অর্জন করেছি বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। এ বই-এ যে তাই অনেক ত্রুটী রয়ে গেছে, তা আমি বিশেষ করেই জানি।

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপলক্ষে, তাড়াতাড়ি লেখা প্রবন্ধ একত্র ক'রে ছাপাতে সংকোচ বোধ করেছি। কিন্তু আমার প্রকাশক শ্রীযুত মহাদেব সরকার ও অন্য কয়েকজন বন্ধুর নির্বন্ধাতিশয্যে সে সংকোচ অতিক্রম করার সাহস পেয়েছি।

মার্ক্‌স্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা এ ধরণের বই বাংলা ভাষায় বেশি নেই ব'লে আশা করছি যে, পাঠকেরা এই প্রবন্ধ-সমাবেশের বহু ত্রুটী মার্জ্জনা করতে কার্পণ্য করবেন না।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
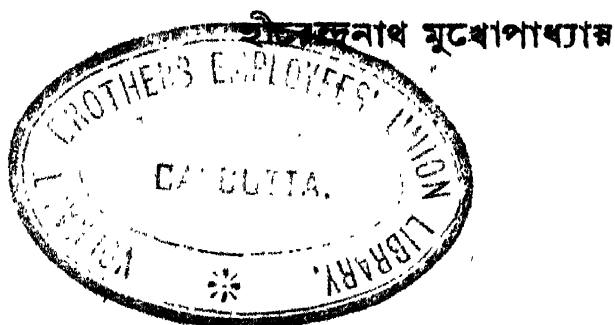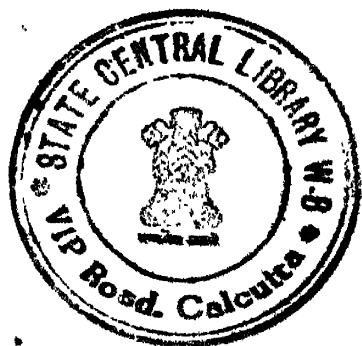
মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের

করকমলে—

সূচী

ভারতজাতীয়তার জন্ম

রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা সাধারণত ব'লে থাকেন যে সমগোষ্ঠী ও সমস্বার্থতার, অভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবর্তমানে জাতীয় ঐক্যবোধের উদ্ভব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয়তার এই সব উপাদান লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু জাতীয়তার মূল কারণ হচ্ছে বহুজনের আত্মীয়ভাব ("we feeling"), সে আত্মীয়ভাব যে-উপায়েই উদ্ভূত হোক না কেন। ফরাসী মনস্বী রেনাঁ বলেছিলেন যে জাতীয়তাব সংজ্ঞা দিতে হলে জাতীয়তাবোধের কথাই বলতে হয়, মিলনগ্রন্থির-যে কী উপাদান তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যে কারণেই হোক, আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ থাকলেই আমরা নিজেদের একজাতি ব'লে প্রচার করতে পারি।

কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে সামান্য পরিচয়েই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের চিন্তা, আমাদের বোধ, সমাজনিরপেক্ষ নয়। জাতীয় ঐক্যের বাস্তবক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে আমরা জাতীয় ঐক্যের কথা ভাবতে পারি না। এই কারণেই দেখা যায়, ইতিহাসে জাতীয়তার জন্ম হয়েছে বিলম্বে। যে-কোনো ছাত্র বলতে পারবে, আমরা যে-অর্থে 'জাতি' কথাটি ব্যবহার করি, সে-অর্থে জাতির উদ্ভব সম্প্রতি হয়েছে। লর্ড অ্যাক্টন বলেছেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পোলাণ্ডকে যখন প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া আর রাশিয়া ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছিল, তখন থেকে জাতিবোধের পত্তন হয়েছে। তাঁর মত যে আমাদের মেনে নিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই; কিন্তু জাতিবোধ-যে ইতিহাসে বহু

পূর্বে দেখা দেয়নি, তা নিঃসন্দেহ। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিশেষ ভৌগলিক, রাষ্ট্রিক, ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সেখানে জাতীয়ভাবের উৎপত্তি হয় বটে; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে জাতীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ হওয়ার তেমন প্রয়োজন ছিল না। বিপ্লবের তুমুল তাণ্ডবের মধ্যে সামন্তশাসনের ভগ্নস্তূপ থেকে ফরাসী জাতীয়তার জন্ম হয়। জার্মান জাতি-বোধের প্রথম প্রকাশ হয় নেপোলিয়ানের আক্রমণ, প্রাশিয়ার প্রতিরোধ চেষ্টার আর ফিথ্‌টা প্রভৃতির বক্তৃতাতে। তারপর ইটালিয়ান, স্লাভ প্রভৃতিরা জাতিসত্তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ঊনবিংশ শতক হচ্ছে জাতীয়তার যুগ; প্রাচ্যদেশগুলিও তার ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি।

আমাদের দেশে জাতীয়তাবোধ কখন ও কীভাবে দেখা দিয়েছে, এ প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন। অবশ্য যাঁরা আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিরোধী বা সাফল্যে আস্থাহীন, তাঁরা ব'লে থাকেন যে, এদেশে জাতীয়তার উপাদানসমূহের একান্ত অভাব আছে। তাঁদের মতে ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা ভৌগলিক আখ্যা মাত্র; সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থায়, শিল্পোৎপাদন-পদ্ধতিতে বহু বৈষম্যের ফলে জাতীয় ঐক্যবোধ সম্ভব হয়নি, বৈচিত্র্য হয়েছে জাতীয়তার প্রতিবন্ধক।

এ সিদ্ধান্ত-যে ভ্রান্ত, তা অন্তত ভারতের আধুনিক ইতিহাস প্রমাণ করেছে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য দেখতে না পাওয়া হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টির অভাবের পরিচয়; যে শুধু গাছ দেখে, বন দেখে না, তাকে অন্ধ বলা চলে। ভারতের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠ লেখক আলোচনা করেছেন। বিশেষত ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "The Fundamental Unity of India" ও "Nationalism in Hindu Culture" পুস্তকে বহু উদাহরণ দেখিয়ে ঐ ভ্রান্ত মত খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে

ভারতবর্ষের তীর্থ, দেবায়তন, চৈত্য, পূত নদনদী, প্রাচীন হিন্দুদের ভৌগলিক জ্ঞান, জন্মভূমি-প্রীতি—এ সবই দেশের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের সাক্ষ্য দেয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় থেকে মারহাট্টাদের যুগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে ঐক্য-সূত্রের সন্ধান অনেকে পেয়েছেন। প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের মতো অনেকে আবার আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রিক জাতিবোধ সম্বন্ধে ব্যস্ত হয়নি, সংস্কৃতি বিষয়ে জাতিবোধ বহুদিনই ছিল, পশ্চিমের সংস্পর্শে তা নষ্ট হয়েছে। "The Soul of India" পুস্তকে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রায় একই ধরণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে ইয়োরোপে জাতীয়তার ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য, আর এদেশে হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর মৈত্রী; মুসলমান শাসনে ভারতীয় ঐতিহ্য ব্যাহত হয়নি, ইংরেজ শাসনে হয়েছে। কিন্তু বাস্তবের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দেশের ইতিহাস পড়লে মনে হয়, ঐরূকম মত সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করা যায় না। বিপিনবাবু প্রভৃতি লেখকের সম্বন্ধে মনো-বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে "wish fulfilment"; তাঁরা মনে মনে যা চেয়েছেন, তাকে ঐতিহাসিক পোষাক পরিয়েছেন। অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না যে, বহুকাল ধ'রে সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃতি বিষয়ে ঐক্য চ'লে এসেছে; দ্রাবিড়দেশেও কোনো বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়নি। কিন্তু একথা স্বীকার করলেও আমরা আজ ভারতীয় জাতীয়তা বলতে যা বুঝি, তার উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে পারব না। হিন্দুস্থান শুধু হিন্দুর বাসভূমি নয়: ভারতের জাতীয়তা শুধু হিন্দুর জাতীয়তা নয়। হিন্দু-ভারতে জাতিবোধের বহু উপাদান আছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুদের রক্তের তফাৎ না থাকলেও ধর্মবৈষম্য, জাতিভেদ, বিজয়গর্ব আর অত্যাচারের স্মৃতি মিলে দুই সমাজের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় জাতিবোধের জন্ম কবে হল, এ প্রশ্নের উত্তর শুধু হিন্দু-ভারতের ইতিহাস দিতে পারবে না।

অনেকের মতে পাশ্চাত্য সংস্পর্শ হচ্ছে আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল কারণ। ব্যাপক অর্থ ধরলে এ মতকে মানা অসঙ্গত নয়। ন্যাশনালিজমের যে কোনো স্বদেশী প্রতিবাক্য নেই, তা বহুবার শোনা গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুলপ্রচারিত "ন্যাশনালিজম্" বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, জাতীয়তা শুধু ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়, বিশ্বমানবের সভ্যতার পক্ষেও হানিকর। ইংরেজ শাসনের ফলেই-যে ভারতে জাতীয়তা দেখা দিয়েছে, তাঁর এই কথাটিই আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। অনেকেরই মতে ইংরেজী শিক্ষা আমাদের জাতিবোধ জাগিয়েছে; এখানে জাতীয়তার প্রথম যুগে ম্যাগ্না কার্টা, হ্যাম্পডেনের বক্তৃতা, ডেনমানের রায় ইত্যাদি থেকে উধৃতি প্রায়ই দেখা যেত। আরও বলা চলে যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিতশ্রেণী নিজেদের বক্তব্য পরস্পরকে বোঝাতে পারত, ইংরেজী সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট অপভ্রংশ তারা ধার করতে পেরেছিল, আর পাশ্চাত্য ইতিহাস থেকে জাতীয়তা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। এর ফলে রাষ্ট্রে ও সমাজে সংস্কার সাধনের জন্য তারা উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছিল, এমনকি তারা শীঘ্রই বুঝেছিল যে, স্বায়ত্তশাসনের অভাবে সমাজের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারও সম্ভব হয় না। ইংরেজী শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করলে আর একদিক থেকে দেখা যায়, বিজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলন আরম্ভ হয়, ধর্মের আবরণ সত্ত্বেও জাতিবোধ দেশে অগ্রসর হতে থাকে।

কিন্তু সহজে জটিল প্রশ্নের উত্তর মিলবে আশা করা ভুল। ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তার উদ্ভব হয়েছে বলা চলে না। প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষিতেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এতই দৃঢ়-প্রত্যয় ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে যথার্থ স্বাদেশিকতা ও জাতিবোধ একরকম

অসম্ভব ছিল। পরবর্তী যুগে শিক্ষিতেরা শাসনসংস্কারের জন্য আবেদন আরম্ভ করেন, সিভিল-সার্ভিসের বড় চাকরীতে দেশের লোকের প্রবেশাধিকারের জন্য ব্যস্ততা দেখান, লাটবেলাটের কাউন্সিলে সভ্যপদের জন্য আন্দোলন করেন। কিন্তু তাঁদের জাতিবোধ তখনও অসম্পূর্ণ; তাঁরা তখনও দেশের শাসনব্যবস্থার কর্তৃত্বের দাবী করেননি। যে-জাতীয়তা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের সংকল্প ও উদ্যোগ করে না, সে জাতীয়তা হচ্ছে পঙ্গু। বিদেশী প্রভুত্বকে অপসারণের কথা প্রচার করার সময় থেকেই জাতীয়তা পূর্ণাঙ্গরূপে দেখা দিয়েছে। শিক্ষিতেরা যখন বুঝল যে শাসনকর্তৃত্ব বিদেশীর হাতে থাকায় তাদের শ্রেণীস্বার্থের হানি হচ্ছে, তখনই তারা যথার্থ জাতীয়তাবাদী হতে লাগল, তখনই রাষ্ট্রব্যাপারে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ফলপ্রদ হল। ইংরেজী শিক্ষা ভারতে জাতীয়তাবাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে বটে; কিন্তু এক বিশেষ অর্থনৈতিক আবেষ্টনের মধ্যেই সে প্রভাব সম্ভব হয়েছে।

* * *

এই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। সাভারকার প্রমুখ কয়েকজন তথাকথিত 'সিপাহী-বিদ্রোহকে' জাতীয় স্বাধীনতাসংগ্রাম বলেছেন; কিন্তু তাঁদের মতকে অত্যুক্তি বলতে হবে। বিদ্রোহ-যে ইংরেজ প্রভুত্ব দূর করার প্রথম বিরাট প্রচেষ্টা, ভারতের জাতিবোধের প্রথম প্রকাশ, তা বলা ভুল নয়। ১৮৫৭ সালের পূর্বেই বাংলা-বিহারের সাঁওতালদের মতো অনেকে বিচ্ছিন্নভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছিল। তখন সমস্ত উত্তর-ভারতের চাষীরা বিক্ষুব্ধ ছিল; কেবল পল্লীসমাজের স্বতন্ত্র জীবনধারা ও শাসন-শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত ছিল ব'লে তারা একত্র হয়ে বিদ্রোহ করার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। তাদের অভাব ছিল নেতৃত্বের। পররাজ্যগ্রাসপটু ইংরেজ সরকারের চাতুর্য ও শক্তি যে সব সামন্ততান্ত্রিকদের অপ্রসন্ন করেছিল, তারাই অসহায় প্রজামণ্ডলীর

অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহের নেতৃত্বস্থান অধিকার করেছিল। বিদ্রোহে-যে উত্তর-ভারতের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল তা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু জাতীয়তার প্রথম প্রকাশ হিসাবে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে দারুণ অপরিণতির লক্ষণ অনেক ছিল। অধিকাংশ নেতার উদ্দেশ্য ছিল মোগল ও মারহাট্টাদের সামন্ততন্ত্রী শাসন পুনরুদ্ধার করা; অথচ সামন্তশাসনে জাতীয়তার প্রসার অসম্ভব। সামন্ততন্ত্রীদের মধ্যে প্রধানত নিজাম ও শিখেরা ইংরেজের শক্তি দেখে কাপুরুষের মতো বিদেশীর পক্ষ সমর্থন করেছিল, আর তাদের প্রতিপক্ষ দেশে পাশ্চাত্য প্রভাব ও পাশ্চাত্য ব্যবস্থার উপদ্রব দেখে ইতিহাসের চাকাকে আটকে রাখার বৃথা চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় সমাজের আসল কাঠামো ইংরেজ রাজত্বে ভেঙে গিয়েছিল; ভারতবর্ষ তার প্রাচীন জীবন হারিয়ে নতুন জীবনের সাক্ষাৎ তখনও পায়নি। কিন্তু নির্মম পরাজয় সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা এক বিষয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল; ইংরেজ আমলে কৃষির অবনতি, লোলুপ সাম্রাজ্যগর্বীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতীয় শিল্পের বিনাশ, জনসাধারণের দুর্গতি বৃদ্ধি, অনভ্যস্ত বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি নানা অসন্তোষকে তারা একত্র করেছিল। তাই আমাদের জাতীয়তার ইতিহাসে সিপাহীবিদ্রোহের গুরুত্ব খুব বেশি।

* * *

কয়েকজন লেখক আমাদের জাতীয়তার উদ্ভব সম্বন্ধে অর্থনৈতিক কারণের আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই বর্ণনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেননি, মুখ্য-গৌণ বিচার করেননি, ইতিহাসের কোনো ঘটনাই-যে আকস্মিক নয়, সেকথা বোঝার চেষ্টা করেননি। সাধারণত বলা হয়, এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াত ও ভ্রমণ সুকর হওয়ায় প্রাদেশিক সংকীর্ণতার স্থলে জাতীয় ঐক্যবোধ সম্ভব হয়েছে, সুদূর সীমান্তেও ভারতবাসী

তার ভারতীয়ত্ব অনুভব করতে পেরেছে। বিরাট দেশের মধ্যে এই ঐক্যবোধ বিস্তারের ফলে আর এদেশকে একটা ভৌগলিক আখ্যামাত্র বলা চলে না। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতবর্ষে আরও মূলগত পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে "নিউ-ইয়র্কট্রিবিউন" পত্রে কার্ল্‌মার্ক্‌স্‌ ভারতে ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার অনুসরণ ক'রে আমরা বলতে পারি, হিন্দুস্থানের সমাজবিপ্লবে ইংরেজ শত অপরাধ সত্ত্বেও ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে।

লালা লাজপত রায় তাঁর বিখ্যাত "Young India" পুস্তকে বলেছিলেন, ভারতীয়দের সহজাত দেশপ্রেমের চেয়ে ইংরেজের শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা, তাদের সংবাদপত্র, আইন আদালত, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর, ষ্টীমার প্রভৃতি জাতীয়তাস্ফুরণে কম করেনি। অর্থাৎ হয়ত অজ্ঞাতসারেই ইংরেজ জাতীয়তার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করেছে। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝব যে, ভারতে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের জাতীয়তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রথম যুগে ভারতীয় শিল্পকে নষ্ট করলেও ইংরেজ পরে এখানে আধুনিক কারখানা বসাতে বাধ্য হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথমে নিতান্ত নরমপন্থী ছিল; কিন্তু যখন ক্রমেই বিদেশী ধনিকদের শোষণনীতি পরিস্ফুট হতে লাগল, যখন ভারতবাসী বুঝল যে দেশের শিল্পে তাদের অধিকারে বিদেশী হস্তক্ষেপ ক'রে চলেছে, তখনই কংগ্রেসের সুর গরম হল, জাতীয় অনুভূতি প্রবলতর হল। ১৮৫৩ সালে মার্ক্‌স্‌ লিখেছিলেন; "বিলাতের কারখানার মালিকেরা সস্তায় তুলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল যোগাড় করার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু যে-দেশে লোহা আর কয়লার খনি আছে, সে দেশের যানব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের প্রবর্তন হলে সেখানে আর যন্ত্রনির্মাণকে প্রতিরোধ করা যায় না। একটা বিরাট দেশে রেলপথের শাখাপ্রশাখা বজায় রাখতে গেলে রোজকেরোজ যা দরকার তা

সরবরাহের জন্ত কারখানা চাই। এর ফলে যেসব শিল্পের সঙ্গে রেলপথের কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্ত কলকজার প্রচলন বাড়বে। তাই রেলপথের ব্যবস্থা সত্যই ভারতবর্ষে আধুনিক কলকারখানার অগ্রদূত হবে। এখানে বৈজ্ঞানিক শিল্পব্যবস্থা প্রবর্তনে সাম্রাজ্যতন্ত্রের বহু বাধা সত্ত্বেও, মার্ক্‌সের এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় সফল হয়েছে। ভারতের জাতীয়তা বাস্তবিক তখনই জন্ম নিল যখন এদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী বুঝল যে দেশের শাসনকর্তৃত্ব না থাকলে শিল্পোন্নতির ফল পরহস্তগত হতে বাধ্য।

এ কথা মনে রাখলে আমরা জাতীয়তাবাদের উপর রমেশ চন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজী, বামনদাস বসু প্রভৃতির অর্থনৈতিক প্রবন্ধাদির প্রভাবের কারণ জানতে পারব। কী ভাবে বহুদিন ধরে বিদেশীয়রা এদেশের অর্থ লুটে নিয়ে গেছে, তার পরিচয় পেয়ে জাতীয় আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হতে পেরেছে। ইংরেজ শাসনে দেশের টাকা বিদেশে ক্রমাগত চালান হয়েছে। ইংরেজদের আগে যারা ভারত জয় করেছিল, তাদের সময় অন্তত দেশের টাকা দেশেই থাকত। নানা ফন্দিতে ইংরেজ এদেশের টাকা বিলাতে পাঠিয়েছে; তারা ভারতবর্ষের উপর যে সরকারী দেনা চাপিয়েছে, তার অধিকাংশই আমাদের ঘাড়ে নেবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এ ছাড়া অবশ্য আছে বিদেশী ব্যবসায়ীর মোটা মুনাফা, গঙ্গার দু-ধারের পাটকলগুলো দেশী কুলিদের দেড়শো টাকা দিলে অন্তত বারশো টাকা স্কটল্যাণ্ডে পাঠিয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে দেশের টাকা বাইরে যাওয়া সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। তাছাড়া সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে এদেশে ইংরেজ সৈনিকের সংখ্যা খুব বাড়ানোর ফলে মিলিটারী বাজেট ফেঁপে ওঠে, বিদেশীশাসন আমাদের তখন আরও অসহ্য লাগে।

বিদেশীশাসন শুধু-যে আমাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিচ্ছে তা নয়, আমাদের অন্নকে পর্যন্ত হস্তগত করছে—এই ধারণা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। কংগ্রেস তাই আর পূর্বের মতো কেবল দেশের লোকের জন্য কতকগুলো চাকরী দাবী ক'রে ক্ষান্ত হল না; কংগ্রেস চাইল অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীনতা, দেশের আয়ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব। স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হল। অন্য দিকে দেখা যায় যে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ইংলণ্ড থেকে, বিশেষত ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে আমদানী সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাকুল ছিল; এমনকি আমদানীর উপর শুল্ক বসানো হলেও ল্যাঙ্কাশায়ারকে সাহায্য করার জন্য দেশী সুতা ও কাপড়ের উপর বিশেষ কর চাপিয়েছিল। আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ল্যাঙ্কাশায়ারের দরকারী তুলা সরবরাহের জন্য ইংরেজ সরকার পূর্তকার্যের ব্যবস্থা প্রধানত পাঞ্জাবের মতো যেখানে তুলা উৎপন্ন হয় এমন প্রদেশে করেছে। কিন্তু জাতীয়তার শক্তিকে বেশি দিন আটকে রাখা চলেনি; নানা উপায়ে এখানকার লৌহশিল্পকে সাহায্য ক'রে আর কিছুকাল ধ'রে ল্যাঙ্কাশায়ারের কর্তাদের অগ্রাহ্য ক'রে, দেশী কাপড়ের কলগুলিকে দেশ সাহায্য করেছে।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতিটি প্রধান আন্দোলনের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যাবে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন চলেছিল, তার স্বদেশী আন্দোলন বলেই প্রসিদ্ধি বেশি। মহাযুদ্ধের সময় যে-অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, তারই ফলে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে জনসাধারণের যোগদান সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৯-৩০ সালে সারা পৃথিবীতে অর্থ-নৈতিক সংকট আরম্ভ হয়; আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অর্ধেক হয়ে যায়, রূপার দর কমার ফলে গরীব চাষীমজুরের সামান্য সঞ্চয় তুচ্ছ হয়ে পড়ে, আর সরকারী মর্জিতে টাকার দর

বাঁধা হওয়ায় দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায়-যে মহাত্মা গান্ধী আবার ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রকে সন্ত্রস্ত করতে পেরেছিলেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার, ভারতীয়ে আর ইংরেজে চাকরী নিয়ে ঝগড়া, রেলে ষ্টীমারে ইংরেজের হাতে ভারতীয়ের লাঞ্ছনা, অস্ত্র আইন—প্রভৃতি ব্যাপারকে অর্থনৈতিক সম্বন্ধে না ফেলতে পারলে জাতীয়তার জন্ম বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে না। প্রকৃত জাতীয়তার পক্ষে দরকার শুধু জাতীয় ঐক্যবোধ নয়, জাতির বাস্তব স্বার্থের সঙ্গে সে ঐক্যবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মাত্র ঐক্যবোধে যদি জাতীয়তা গঠন করা চলত, তাহলে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী যে স্বার্থনিরপেক্ষ ঐক্যবোধ প্রচার করেছেন, তা বিফল হ'ত না। তাঁদের প্রচাব ব্যর্থ হওয়ার একটা কারণ এই যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁরা যে একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য দেখেন, তাকে ধরাছোঁয়া যায় না ; আর আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ভারতবাসীদের-যে প্রায় একচেটে অধিকার, তা বিশ্বাস করা শক্ত। তা ছাড়া হিন্দু অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে এই মার্জিত ভারতপ্রীতির যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, তার ফলে মুসলমানদের পক্ষে ঐ ধরণের জাতিবোধ অনুভব করা বিশেষ দুরূহ। একমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তিব উপর জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানকে একত্র আনা যাবে। এই আন্দোলনের ফলে আমরা দেখেছি যে আমাদের জাতীয়তা এপর্যন্ত অর্থনীতির বাস্তব ভিত্তি বিনা সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারেনি ; সুতরাং আজও জাতীয়তার সঙ্গে দেশের জনগণের স্বার্থের কী সম্পর্ক তা পরিষ্কার না করতে পারলে আমাদের মুক্তি-আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে।

পৃথিবীর সর্বত্রই মধ্যবিত্তশ্রেণী জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা হয়েছে। আমাদের দেশেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। বিদেশীয় শোষণনীতি

তাদের জাতিবোধকে জাগ্রত করেছে, মুক্তি সংগ্রামে প্রবুদ্ধ করেছে। কিন্তু ক্রমেই জাতীয় আন্দোলন এমন এক স্তরে উপস্থিত হচ্ছে যখন দেশের জনগণ কেবল বিদেশী নয়, স্বদেশী ধনিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছে, জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের ভার অর্থবানদের হাতে ছাড়তে রাজী হচ্ছে না। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি অধ্যায়েই তাই তদানীন্তন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাপক ও বলীয়ান করতে হলে একথা ভুললে চলবে না। সুতরাং আজ হিন্দু-ভারতের ঐক্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন কম, যে দুর্জ্ঞেয় আধ্যাত্মিকতাকে ভারতীয় জীবনের সারবস্তু ব'লে প্রচার করা হয়, সেকথা না বলাই বোধহয় শ্রেয়। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি ও আদর্শ প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই নির্ণীত হয়ে থাকে। মানুষ অবশ্য ইতিহাসের হাতে কলের পুতুল একেবারেই নয়: "Men make history, but not as they please"।*
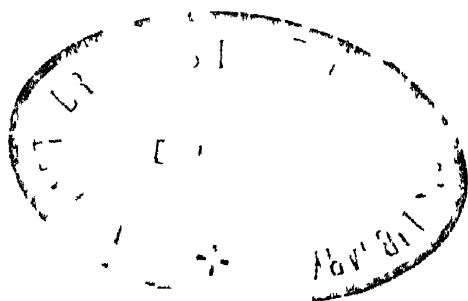
* "পরিচয়" হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ভারতবর্ষ ও কার্ল মার্কস্

বিখ্যাত অধ্যাপক ল্যাস্কি একবার বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের জটিল সমস্যা সমাধানে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ করতে হলে সূক্ষ্ম উদ্ভাবনীশক্তির খুবই প্রয়োজন, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো সুফল আশা করা যায় না। পশ্চিম ইয়োরোপের পণ্ডিতম্মন্য 'সোশালিস্টদের' মুখে এরকম কথা শুনে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। ১৮৫৩ সালে নিউ ইয়র্কের এক কাগজে মার্ক্‌স্ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে-ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এবং তাঁর আজীবন সহকর্মী এঙ্গেল্‌সের সঙ্গে চিঠিপত্রে ভারতবর্ষের কথা নিয়ে যে আলোচনা তিনি করেছিলেন, তাতে আমাদের জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিলাতের 'সোশালিস্ট' মহল যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাবে, তাতে আর বিস্মিত হবার কিছু নেই।

১৮৪৮ সালে কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে মার্ক্‌স্ এবং এঙ্গেল্‌স্ ভারতবর্ষে ও চীনদেশে নতুন বাজার আর ব্যবসার আড্ডা তৈরী হওয়ার ফলে ধনিক ব্যবস্থার বিকাশে যে-প্রভাব পড়বে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; ঐ বৎসর ইয়োরোপের নানা দেশে বিপ্লবের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোথাও তা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন ইয়োরোপের বাইরে—এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকাতে ধনিক উৎপাদনী ব্যবস্থার প্রসারে। এ বিষয়ে মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌সের কয়েকটি মূল্যবান চিঠি আছে। ১৮৫৮ সালের ৮ই অক্টোবরে মার্ক্‌স্ এঙ্গেল্‌স্‌কে লেখেন:—

'বুর্জোয়া সমাজ আবার যেন দ্বিতীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য দিয়ে চলেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে তার জন্ম, আর এবার তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে ব'লে আমি মনে করি। বুর্জোয়া সমাজের প্রধান কাজ হচ্ছে সারা দুনিয়াতে নিজেদের মুনাফা বাড়াবার জন্য বাজার সৃষ্টি করা আর সেই বাজারের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। কিন্তু পৃথিবী গোল; তাই আর নতুন বাজার তৈরী করার জায়গা নেই। এখন আমাদের সামনে সমস্যা হচ্ছে এই:—ইয়োরোপে বিপ্লব আসন্ন, আর তা সাম্যবাদী রূপ নিতে বাধ্য; কিন্তু এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকাতে বুর্জোয়ারা যদি প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকে তো এই ছোট্ট ইয়োরোপে বিপ্লবী আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট তারা করবেই।'

এ কথা মার্ক্স্ বলেছিলেন প্রায় আশী বছর আগে; অনেকেই আজ তার যাথার্থ্য বুঝছেন। ইয়োরোপ দুনিয়ার সর্বত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে ব'লেই বুর্জোয়া-ব্যবস্থা মরেও মরছে না। ভারতবর্ষের মতো তাঁবেদারী দেশই হচ্ছে তাই সাম্রাজ্যবাদের আসল খুঁটি। এই তাঁবেদারী দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিপন্ন পর্যুদস্ত না হ'লে ইয়োরোপের জনসাধারণও বুর্জোয়াদের কবল থেকে মুক্তি পাবে না। আমাদের ভবিষ্যতে কী ঘটবে ভেবে অনেক সময় আমরা ইয়োরোপের দিকে চেয়ে থাকি; কিন্তু ইয়োরোপেরও ভবিষ্যৎ আমাদের চেষ্টা, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের গণশক্তির উপর নির্ভর করছে। দুনিয়ার যারা সর্বহারা, তাদের আন্দোলন সর্বদেশে একই সূত্রে গ্রথিত রয়েছে।

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের প্রাচীন পল্লীব্যবস্থা (Village System) ভেঙে গেছে। এর মূলগত কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে মার্ক্সের চিন্তাধারা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

১৮৫৩ সালে এঙ্গেল্স মার্ক্সকে এক চিঠিতে লেখেন যে প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সেখানে ভূমিস্বত্ব কখনও ব্যক্তিগত

সম্পত্তি ব'লে পরিগণিত হয়নি। ইয়োরোপে রোমান, টিউটন, কেল্ট, প্রভৃতি জাতির মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেখানে ক্রমে সামন্ততন্ত্র ও ভূম্যধিকারীশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। প্রাচ্যদেশে কেন তা হয়নি, বোঝাবার জন্য এঙ্গেল্‌স্ আরও বলেন যে, এর প্রধান কারণ হচ্ছে, সেখানে সাহারা থেকে আরব, পারস্য, তাতার হয়ে এশিয়ার সর্বোচ্চ অধিত্যকাগুলি পর্যন্ত বিরাট মরুভূমি বিস্তৃত হয়ে আছে ব'লে কৃষিকর্মের সুবিধার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা অবশ্য-প্রয়োজন ছিল, আর সে ব্যবস্থা করতে সক্ষম ছিল সরকার কিম্বা পল্লীসঙ্ঘ; কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা অসাধ্য ছিল। তাই দেখা যায় যে, এশিয়াতে অতি প্রাচীন কাল হতে মোটের উপর তিনটি সরকারী বিভাগ চ'লে এসেছে—রাজস্ব, যুদ্ধ এবং পূর্তকার্য।

পল্লীব্যবস্থায় প্রত্যেক ছোট গ্রামেরই স্বতন্ত্র জীবনধারা ও শাসনশৃঙ্খলা ছিল। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিলাতে পার্লামেণ্টে পেশ করা একটা পুরাণো সরকারী রিপোর্ট থেকে মার্কস্ একটা লম্বা উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ—

'ভূগোলের দিক থেকে দেখলে—একটা গ্রামে আছে কয়েক শো বা কয়েক হাজার একর চাষের জমি আর পোড়ো জমি। রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে দেখলে—সেই গ্রামের সঙ্গে একটা সমবায় বা পৌরসঙ্ঘের সাদৃশ্য বোঝা যাবে। প্রধান বাসিন্দা বা পটেল গ্রামের সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করেন; গ্রামবাসীদের বিবাদ নিষ্পত্তি কবেন, শান্তিরক্ষার ব্যবস্থাও তদারক করেন আর খাজনা আদায় করেন; গ্রামেব মুহুরির কাছে থাকে চাষবাসের হিসাবদপ্তর; একজন বা দুজন গ্রামবাসী ফৌজদারী ব্যাপারের ভার নিয়ে থাকেন, আর পথিকদের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নিরাপদে পৌঁছে দেন; একজন গ্রামের চৌহদ্দি স্থির রাখেন, দরকার হলে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেন; পুকুর নালা ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক চাষের জন্য জলবিলির ব্যবস্থা করেন; ব্রাহ্মণের উপর দেবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভার থাকে; গুরুমহাশয় ছেলেমেয়েদের হাতে

খড়ি দেন ; জ্যোতিষী পাঁজি দেখে শুভ অশুভ দিন স্থির করেন। সাধারণত এই কয়জন কর্মচারী গ্রামের কাজ চালিয়ে যান ; তাঁদের সংখ্যা কোথাও বেশি, কোথাও বা কম। স্মরণাতীত কাল থেকে এই রকম সাদাসিধে ভাবে গ্রামের শাসন চ'লে এসেছে। গ্রামের চৌহদ্দি নিয়ে অদলবদল অতি কদাচিৎ হয়েছে। আর যুদ্ধ বা মহামারিতে দেশ বিধ্বস্ত হলেও গ্রামের জীবন বিশেষ বদলায়নি। একই নাম, পরিমিতি, চিন্তাধারা গোষ্ঠীবর্গ পর্যন্ত বহুকাল ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রয়েছে। রাষ্ট্রের উত্থান-পতন নিয়ে গ্রামবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হয়নি ; গ্রামের অস্তিত্ব যত দিন অক্ষুণ্ণ ততদিন রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন তাদের বিচলিত করতে পারেনি, গ্রামের অন্তর্ব্যবস্থায় কোনো বিকৃতি ঘটেনি। এখনও গ্রামের মোড়ল পটেল ; ঝগড়া নিষ্পত্তি, সাজার ব্যবস্থা আর খাজনা আদায়ের ভার তার হাতে।'

ভারতবর্ষের এই সমাজব্যবস্থা ইংরেজ বণিকের আবির্ভাবের ফলে সমূলে উৎপাটিত হতে আরম্ভ হ'ল। আরও বহু বিদেশী ভারত আক্রমণ করেছিল, কিন্তু কোনো জাত এমন নিদারুণভাবে এখানকার জীবন-ব্যবস্থায় ওলট্‌-পালট্‌ এনে দেয়নি, ইংরেজের মতো কেউ শুধু বিদেশীই থেকে যায়নি, এদেশে মাত্র কিছুকাল কয়েকজন বাস ক'রে এখানকার দৌলত বিদেশে রপ্তানী করায়নি। তাই মার্কসের ভাষায় বলা যায় :—

'এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষের দুর্গতি পূর্বের তুলনায় শুধু বিভিন্ন প্রকৃতির নয়, বহু গুণ তীক্ষ্ণ ও তীব্রও বটে। এর কারণ কেবল এশিয়ার আর ইয়োরোপের স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের দানবীয় সংযোজন নয় ; ঐ সংযোজন ইংরেজের বিশেষত্ব নয়, ওলন্দাজ শাসনের অনুকরণ মাত্র।— অবিরাম গৃহবিবাদ, আক্রমণ, পরাজয়, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দরুণ ভারত-বর্ষের ইতিহাস আমাদের কাছে জটিল ও সংহাররূপে দেখা দিলেও এ সমস্ত ঘটনা সমাজের বহিরাবরণ স্পর্শ ক'রে গেছে মাত্র, আমূল পরিবর্তন আনেনি।

কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয় সমাজের আসল কাঠামো ভেঙে গেছে। এখনও তা নতুন ক'রে গ'ড়ে ওঠার কোনো চিহ্ন নেই। ভারতবর্ষ তার প্রাচীন জীবন হারিয়ে ফেলেছে, নতুন জীবনের সন্ধান পায়নি। ইংরেজ শাসনে হিন্দুস্থান ঐতিহ্যচ্যুত হয়েছে, তার অতীতের সঙ্গে সংশ্রব হারিয়েছে। এখনকার ভারতীয় জীবনে তাই শুধু-যে বিষাদ আছে তা নয়, একটা বিশেষ রকম অবসাদও মিশে রয়েছে।'

ইংরেজ শাসনের এই সংহার-মূর্তির বর্ণনা মার্ক্‌স্‌ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৮১৩ পর্যন্ত সোজাসুজি লুণ্ঠন চলেছিল—পূর্বতন শাসকরা যে পূর্তকার্য ও জলসেচের ব্যবস্থা করেছিল, ইংরেজ আমলে তা অবহেলিত হ'ল, নষ্ট হ'ল, লুঠের নেশায় তখন ইংরেজ মশগুল। এদেশের মাল যাতে বিলাতে না ঢোকে—এমনকি ইয়োরোপের কোনও দেশে না যেতে পারে—সে জন্য আইন ক'রে আমদানী বন্ধ হ'ল কিম্বা বেজায় বেশি হারে মাশুল বসানো হ'ল। ইংরেজের ভূমিস্বত্ব আইন এখানে কায়েম হ'ল, ইংরেজের ফৌজদারী আইন এল।

উনিশ শতক হ'ল ধনিকতন্ত্রের মরশুমের সময়। ১৭৮৪ থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত আইনকানুনের অদলবদলের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে ব্যবসাতে একচেটিয়া অধিকার নষ্ট হ'ল। ইংরেজ ধনিকতন্ত্রের লীলাক্ষেত্র হ'ল ভারতবর্ষ। আর ইংরেজ পুঁজিদারদের মুনাফা বাড়াবার জন্য এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করা হ'ল। তাই দেখা যায় যে, ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে বিলাত থেকে এদেশে আমদানী মালপত্রের দাম বাড়ল ৩,৮৬,১৫২ পাউণ্ড থেকে ৮০,২৪,০০০ পাউণ্ড। ১৭৮০তে বিলাতের মোট রপ্তানীর মাত্র বত্রিশ ভাগের এক ভাগ ভারতবর্ষে আসত; ১৮৫০ সালে তা চারগুণ বৃদ্ধি পেল। যে-বস্ত্রব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন হ'ল ভারতবর্ষ, বিলাতের লোকসংখ্যার এক-অষ্টমাংশ সেই ব্যবসা থেকেই জীবিকা উপার্জন

করতে লাগল ; বিলাতের রাজস্বের একদ্বাদশাংশ এল বস্ত্রব্যবসায় থেকে। ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পকে নির্মমভাবে নির্মূল করার ফলেই বিলাতের এ সমৃদ্ধি সম্ভব হ'ল।

১৮৫৩ সালের ১০ই জুন তারিখের 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন' পত্রে মার্ক্স লিখেছিলেন: '১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে বিলাত থেকে ভারতে সুতা রপ্তানী ৫,২০০ গুণ বেড়েছিল। ১৮২৪ সালে ভারতবর্ষে দশ লক্ষ গজ বিলাতী কাপড় আমদানি হ'ত কিনা সন্দেহ ; অথচ ১৮৩৭ সালে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজেরও বেশি আমদানি হয়েছিল। ঐ সময়েই ঢাকার লোকসংখ্যা দেড়লক্ষ থেকে বিশ হাজারে নামল। শুধু যে বস্ত্রশিল্পের পীঠস্থানগুলিরই পতন হ'ল তা নয়, ফল হ'ল আরও ভয়াবহ। সারা হিন্দুস্থানে কৃষি ও শিল্পকর্মের মধ্যে যে যোগসূত্র ছিল, তা ইংরেজদের বিজ্ঞান আর বাষ্পযন্ত্র একেবারে ছিন্ন ক'রে দিল।'

'বিলাতের কার্পাসশিল্পে যন্ত্র প্রচলনের ফল ভারতবর্ষের পক্ষে ভয়াবহ হ'ল। ১৮৩৪-৩৫ সালে বড়লাট দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জানালেন, 'বাণিজ্যের ইতিহাসে এরূপ দুর্গতির তুলনা নেই। তাঁতিদের হাড়ে হিন্দুস্থানের মাটি সাদা হয়ে যাচ্ছে'। *

কৃষি ও শিল্পকর্মের অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ ছিল এদেশের পল্লীব্যবস্থার আশ্রয়। ভারতীয় সমাজের খুঁটি ছিল চরকা আর তাঁত। সেই দেশে ইংরেজ ঢুকে তাঁত ভাঙল, চরকাকে নষ্ট করল। ইংরেজ এল অবশ্য নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ; কিন্তু তার আসার ফলে একটা বিরাট সমাজবিপ্লব এদেশে আরম্ভ হয়ে গেল। পুরাণো শিল্পপ্রধান শহরগুলো নষ্ট হ'ল, শহরের লোক গ্রামে গিয়ে ভিড় বাড়াবার ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনে যে সরল সামঞ্জস্য ছিল

*—ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তাও নষ্ট হ'ল। কৃষিকর্ম ছাড়া উপার্জনের উপায় বন্ধ হ'ল ব'লে জমির উপর চাপ বেড়ে গেল, চাষ ক'রে কোনোক্রমে কায়ক্লেশে দিন গুজরান করা শক্ত হয়ে উঠল। আজ পর্যন্ত গ্রামের সেই অবস্থা রয়েছে, চাষীদের দুর্গতির সীমা নেই। সরকার কেবল খাজনা আদায় ক'রেই চলল, কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য সামান্য প্রয়াসও করল না। ১৮৫০-৫১ সালে দেখা যায় যে খাজনা ১ কোটী ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড, অথচ নদীনালা, রাস্তাঘাট প্রভৃতির জন্য মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড খরচ হ'ল। মার্ক্‌স্‌ তাই 'ক্যাপিটালে' এই অবস্থার উল্লেখ ক'রে বললেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি প্রায় অসম্ভব; আর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, তাদের কোনো রকমে বেঁচে থাকতে হবে, সভ্য জীবনের কোনো পরিচয়ই তারা পাবে না। ঐ সময় সম্বন্ধে মার্ক্‌স আরও লিখলেন:—'ইংরেজ পুঁজিদারদের মূলধনের উপর সুদ ইত্যাদিতে ভারতবর্ষ বিলাতে বৎসরে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কর পাঠাচ্ছে। এটা হ'লো 'সুশাসনের' দাম! তাছাড়া ইংরেজ রাজপুরুষেরা তো বেতন থেকে বাঁচিয়ে অনেক টাকা দেশে পাঠাচ্ছে, আর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা লাভের বেশ খানিকটা অংশ খাটাবার জন্য ফেরৎ দিচ্ছে।'

কিন্তু ভারতের প্রাচীন পল্লীব্যবস্থার পতনে মার্ক্‌স্‌ অশ্রু বিসর্জন করতে রাজী হননি। বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে সকল দেশে জনসাধারণের যে দারুণ দুর্গতি ঘটেছিল, তার বর্ণনা অবশ্য মার্ক্‌সের মতো কেউই দিতে পারেনি। কিন্তু তিনি জানতেন যে পল্লীব্যবস্থার মতো প্রাচীন সমাজ-আদর্শ ইতিহাসের পথে প্রবল প্রতিবন্ধক, তাকে নির্মমভাবে অপসৃত করা ভিন্ন উপায় নেই। আমাদের দেশে অনেকে আছেন যাঁরা আগে চলতে চান না, কেবল চেয়ে থাকেন পিছনের দিকে, আবার পুরাণো চরকা-তাঁতের যুগে ফিরে যেতে চান। তাঁদের পক্ষে মার্ক্‌সের কথা বিশেষ ক'রে ভেবে দেখা দরকার:—

'অসংখ্য নিরীহ, শ্রমশীল, কুলপতি-শাসিত পল্লীসমাজ ছিন্নভিন্ন হ'ল,

প্রাচীন জীবনধারা ও জীবিকানির্ব্বাহের বংশপরম্পরাগত ব্যবস্থা নষ্ট হল, যন্ত্রণার অবধি রইল না। এ ঘটনায় আমরা দুঃখ পাই নিশ্চয়, কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে, এই নিরীহ পল্লীসমাজগুলিই ছিল প্রাচ্য স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের যথার্থ ভিত্তি, এরা মানুষের মনকে ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে অবরুদ্ধ ক'রে রাখতো, এদের শাসনে মানুষ হ'ত নিষ্ক্রিয়, কুসংস্কার ও প্রাচীন বিধিনিষেধের দাস, নিজের মহিমা ও পৌরুষ সম্বন্ধে উদাসীন। আমরা ভুলতে পারি না যে তাদের ছিল এক প্রকার বর্বরসুলভ অহমিকা; তাদের অনুরাগ ছিল শুধু খানিকটা জমির উপর; সাম্রাজ্যের পতন, অকথ্য অত্যাচার, জনহত্যা ইত্যাদি তাদের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনার মতো লাগতো, বিচলিত করতো না; অথচ তাদের প্রতি 'কৃপাদৃষ্টি' দিয়ে কেউ আক্রমণ করলে তারা ছিল একান্ত অসহায়। আমরা ভুলতে পারি না যে এই নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, অশ্রদ্ধেয় অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎকট, লক্ষ্যহীন অনাচারের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। নরহত্যা পর্যন্ত হিন্দুস্থানের ধর্মানুষ্ঠানে প্রবেশ করেছিল। আমরা ভুলতে পারি না যে, এই ক্ষুদ্র সমাজগুলিকে জাতিভেদ ও দাসপ্রথা কলুষিত ক'রে রেখেছিল, সেখানে মানুষ পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধককে পরাভূত করার চেষ্টা না ক'রে তার বশ্যতা স্বীকার করতো। অচঞ্চল, অন্ধ নিয়তিতে বিশ্বাস সামাজিক উদ্যোগ ও উন্নতিপ্রচেষ্টাকে নিষ্পিষ্ট করতো, প্রকৃতিপূজার বিধানে মানুষের অধঃপতন সূচিত হ'ত, আর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ নতজানু হয়ে হনুমান ও গোমাতার অর্চনা করতো।'

তাই ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের পদ্ধতিকে মার্ক্স্ জঘন্য আখ্যা দিলেও বলেছিলেন: 'এশিয়ার সমাজব্যবস্থায় আমূল বিপ্লব না এলে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে অভীষ্ট সাধন সম্ভব কিনা? যদি না হয় তবে শত অপরাধ সত্ত্বেও সেই বিপ্লবে ইংলণ্ড অজ্ঞাতসারেই ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে।

মার্ক্‌স্‌ ১৮৫৩ সালে বলেছিলেন: 'ভারতে ইংরেজের কাজ ছিল দু'রকমের—এশিয়ার সনাতন সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করা, আর সেখানে পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তি স্থাপন করা।—ভারতবিজেতাদের মধ্যে ইংরেজই প্রথম সভ্যতায় অধিক অগ্রসর ব'লে হিন্দু সংস্কৃতির কাছে বশ্যতা মানেনি। এবং ইংরেজ এসে দেশের সমাজকে ভেঙেছে, শিল্পকে নির্মূল করেছে, সমাজের যা-কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ছিল তার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেছে। তাদের ভারতশাসনের ইতিহাসে এখনও শুধু ধ্বংসেরই বর্ণনা আছে, ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে পুনর্গঠন চেষ্টা প্রকাশ হতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুনর্গঠন আরম্ভ হয়ে গেছে বলা যায়।'

'পুনর্গঠনের' লক্ষণ মার্ক্‌স্‌ কোথায় দেখেছিলেন ?—এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছিলেন :—

(১) 'মোগল সাম্রাজ্যের চেয়ে সুদূর-বিস্তারী ও সুসংহত রাষ্ট্রীক ঐক্য। আর ইংরেজের অস্ত্র ভারতবর্ষের উপরে যে ঐক্য চাপিয়েছে, তা এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের কল্যাণে দৃঢ় ও স্থায়ী হবে।'

(২) 'স্বরাজ অর্জনে আর বিদেশী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় যাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, সেই ভারতীয় সৈন্যদলকে ইংরেজ গড়ছে, অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছে।' (মার্ক্‌স্‌ লিখেছিলেন অবশ্য ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে ; ঐ ঘটনার ফলে ইংরেজদের সামরিক কর্তৃত্ব কঠোরতর করা হয়, আর ভাবতের সৈন্যদলের এক-তৃতীয়াংশ হয় গোরা)।

(৩) 'স্বাধীন সংবাদপত্র' (১৮৩৫ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৮৭৩ থেকে সাম্রাজ্যতন্ত্রের সংকটের পরিচায়করূপে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সংকোচ আইন প্রবর্তিত হয়)।

(৪) 'ভূমিতে ব্যক্তিস্বত্বের প্রবর্তন, যার বৈপ্লবিক ফলাফল অবশ্যম্ভাবী।'

(৫) 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অল্প কয়েকজন ভারতীয়কে কলকাতায় শিক্ষা দিচ্ছে ব'লে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী আর দেশশাসন ব্যবস্থায় সুদক্ষ এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে।'

(৬) 'বাষ্পযানের কল্যাণে ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপের যোগাযোগ দ্রুত ও নিয়মিত হয়েছে। ভারতবর্ষের পঙ্গুতার যে প্রধান কারণ ছিল বিদেশের সংস্রব বর্জন, তা থেকে দেশ উদ্ধার পেয়েছে।'

মার্ক্স্ বলেছিলেন যে, ভারতের অগ্রগতি নিয়ে বিলাতের শাসকসম্প্রদায় বিশেষ মাথা ঘামায়নি। 'সেখানকার অভিজাতশ্রেণী চেয়েছিল দেশটাকে ঘটা ক'রে জয় করতে, পুঁজিদাররা চেয়েছিল লুঠ করতে, আর কারখানার মালিকরা চেয়েছিলো সস্তায় নিজেদের মাল বেচার সুবিধা যোগাড় করতে।' কিন্তু ক্রমে মালিকরা বুঝলো যে, নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই ভারতবর্ষে সামান্য কিছু শিল্পোৎপাদন দরকার, আর তাই দেশের মধ্যে রেলে যাতায়াত এবং জলসেচ ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে মার্ক্স্ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন :—

'আমি জানি যে বিলাতের কারখানার মালিকরা সস্তায় তূলা ও অন্যান্য কাচা মাল যোগাড় করাব উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু যে দেশে লোহা আর কয়লা উৎপন্ন হয়, সে দেশের যান-ব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের প্রবর্তন হলে সেখানে আর যন্ত্র নির্মাণকে প্রতিরোধ করা যায় না। একটা বিরাট দেশে রেলপথের শাখাপ্রশাখা বজায় রাখতে গেলে রোজ-কে রোজ যা দরকার তা সরবরাহের জন্য কারখানা চাই। এর ফলে যে-সব শিল্পের সঙ্গে রেলের কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য কলকব্জার প্রচলন বাড়বে। তাই রেলপথের ব্যবস্থা সত্যই ভারতবর্ষে আধুনিক কল-কারখানার অগ্রদূত হবে। যে পুরুষানুক্রমিক কর্মভেদ ছিল জাতি-ভেদের ভিত্তি, রেলপথ বিস্তারের ফলে আধুনিক শিল্পের

প্রবর্তন হওয়ায় তা নষ্ট হবে, ভারতের প্রগতির ও গণশক্তির পথের যে চরম অন্তরায় ছিল তা অপসৃত হবে।'

যদি কারুর মনে ধারণা হয়ে থাকে যে, মার্ক্‌স্ তো ক্রমাগত ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের সুপারিশই ক'রে চলেছেন, তবে সে ধারণা হাস্যকর হবে। ভারতের গণশক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে না। ইংরেজ শাসন শুধু তার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করেছে, বিদেশী শাসন এসে অত্যাচার অনাচার ক'রে পুরাণো সমাজের কাঠামো না ভেঙে দিলে তা সম্ভব হ'ত না। কিন্তু বিদেশী শাসনের কাজ সেখানেই শেষ ; ভারতের গণশক্তিই ভারতের ভবিষ্যৎকে গড়তে পারে। তাই মার্ক্‌স্ বলেছিলেন ঃ—

"ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণী যা করতে বাধ্য হচ্ছে, তাতে গণসাধারণের দাসত্ব মোচন বা সামাজিক অবস্থার উন্নতিও হবে না। সেজন্য শুধু দেশের উৎপাদনীশক্তির সংবর্ধন নয়, সে শক্তিকে গণসাধারণের কারায়ত্ত করা প্রয়োজন, ইংরেজ শাসনে এই উভয় ব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি নিশ্চয় স্থাপিত হবে। কিন্তু কোথাও কি বুর্জোয়াশ্রেণী এর বেশি কিছু করেছে ? তারা কি কখনও মানুষকে রক্ত আর পঙ্কিলতা আর দুঃখ-দুর্দশার মধ্য নিয়ে না টেনে সমাজের উন্নতি সাধন করতে পেরেছে ? যতদিন বিলাতের শ্রমিকেরা শাসকশ্রেণীকে নিষ্কাসিত না করে, কিম্বা ভারতীয় জনসাধারণ আত্মশক্তিবলে ইংরেজদের শাসন-শৃঙ্খল চূর্ণ না করে—ততদিন ইংরেজ বুর্জোয়ারা ভারতবর্ষের সমাজক্ষেত্রে যে নতুন বীজ বপন করেছে তার ফল ভারতবাসী পাবে না। তবু আমরা নিশ্চিন্ত মনে সেদিনের প্রতীক্ষা করতে পারি যখন শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, সেই বিশাল, চিত্তাকর্ষক দেশের পুনর্জীবন আসবে, যে দেশের শান্ত অধিবাসীরা প্রিন্স সলটিকভের ভাষায় 'ইতালিয়ানদের চেয়ে মার্জিত ও নিপুণ, যারা বশ্যতা স্বীকার করলেও নিজেদের সৌম্য আভিজাত্য হারায়নি, যারা স্বাভাবিক শৈথিল্য সত্ত্বেও যুদ্ধে অসাধারণ বীর্য দেখিয়ে ইংরেজ নায়কদের

আশ্চর্য করেছে, যাদের দেশ হচ্ছে আমাদের ভাষা—আমাদের ধর্মের উৎস, যাদের জাটদের মধ্যে প্রাচীন জার্মাণ ও ব্র.হ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকের মূর্তি আমরা দেখতে পাই।"

আজ বিশ্বব্যাপী সংকটের দিনে আমাদের বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাস ভারতবাসীর উপর যে দায়িত্ব চাপিয়েছে আর তাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।*

* পরিচয়, চৈত্র—১৩৪৭

ভারতের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—'যা নেই ভারতে, তা নেই জগতে'—এ প্রবাদের মূলে শুধু স্বদেশ সম্বন্ধে একটা মোহ নেই, আছে অকাট্য সত্য। দুনিয়ার দৌলত আছে আমাদের দেশে। তাই যুগ যুগ ধরে দুনিয়ার দস্যুরা লুঠের আশায় এখানে এসেছে, জেঁকে ব'সে রাজত্ব ফেঁদেছে। এমন দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব হচ্ছে সত্যই একটা তাজ্জব ব্যাপার। সকল ভারতবাসীর সমৃদ্ধির সংস্থান এদেশে রয়েছে, অথচ দারিদ্র্যের তাড়নায় দেশবাসী আজ মুমূর্ষু। ভারতবাসীরা গরীব, কিন্তু ভারতবর্ষ গরীব দেশ নয়।

সকলেই জানেন যে দু'শোবছর আগেও বিদেশীরা এদেশের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখে গেছে। ১৭৫৭ সালে বাংলার পুরাণো রাজধানী মুর্শিদাবাদ দেখে ক্লাইভ বলেছিল যে, মুর্শিদাবাদ লণ্ডনের মতোই বিস্তৃত, সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ শহর; তফাৎ শুধু এই যে, মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠীরা লণ্ডনের ধনকুবেরদের চেয়ে অধিক ঐশ্বর্যশালী। ১৭ ও ১৮ শতকে বিদেশী পর্যটকরা ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে যে সম্পদ লক্ষ্য করেছিল আজ আর তার অস্তিত্ব নেই। ফরাসী তাভের্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখা যায়, এদেশের ক্ষুদ্রতম গ্রামেও চাল, ময়দা, মাখন, দুধ, সিম ও নানাবিধ শাকসব্জী, চিনি ও বহু প্রকার মিষ্টান্ন অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। বাদশাহ অওরংজেবের প্রধান চিকিৎসক ইতালীবাসী মানুচী ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের ঐশ্বর্যের উচ্ছ্বাসিত বর্ণনা রেখে গেছেন। বাংলা দেশেই ইংরেজ আমলের প্রথম পত্তন হয়েছিল;

বাংলার দারিদ্র্যের আজ আর সীমা নেই। তাই এই বাংলাদেশ সম্বন্ধে মানুচী কী বলেন দেখা যাক :—

'মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে বাংলাদেশের খ্যাতি ইয়োরোপে সবচেয়ে বেশি। বাংলার মাটীর উর্বরতা অসাধারণ, আর বাংলা থেকে বিদেশে প্রচুর মালপত্র রপ্তানী হয়ে থাকে। মিশরের তুলনায় এদেশ একেবারেই নিকৃষ্ট নয়; এমন কি রেশমী ও সূতী কাপড়, চিনি আর নীল উৎপাদনে বাংলা মিশরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ফল, শস্য, দাল, মস্‌লিন, রেশমী ও স্বর্ণখচিত বস্ত্র—সবই এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়।'

আন্দাজ ১৬৬০ সালে ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার বাংলা দেশ সম্বন্ধে লেখেন :—"দু'বার বাংলায় ভ্রমণ ক'রে আমার ধারণা হয়েছে যে, বাংলাদেশ মিশরের চেয়ে ঐশ্বর্যশালী। এখান থেকে রেশমী ও সূতী কাপড়, চাল, চিনি, মাখম ইত্যাদি প্রচুর রপ্তানী হয়। ধান, গম, শাকসব্জী ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যথেষ্টেরও বেশি উৎপাদন হয়ে থাকে। কৃষির জন্য জলসেচ ও জলপথে যাতায়াতের সুবিধার উদ্দেশ্যে কোন এক সুপ্রাচীন যুগে রাজমহল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বহু যত্নে অসংখ্য খাল কাটা হয়েছিল।"

ইংরেজ আমলের আগে এদেশের অবস্থা খুব ভাল ছিল্ না প্রমাণ করার জন্য সিভিলিয়ান মোরলণ্ড্ কোমর বেঁধে লেগেছিলেন; "India at the Death of Akbar" আর "From Akbar to Aurungzeb", এই দুই বই-এ তার নমুনা মিলবে। কিন্তু তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে গ্রামের লোকদের মাথাপিছু গড় আয় তখন থেকে কিছু বদলায়নি। বিদেশী বাণিজ্য, জাহাজ তৈরীর ব্যবসা আর বস্ত্রশিল্প থেকে যে-আয় হ'ত, তা এদেশেই থেকে যেত, এ কথা তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে। সিভিলিয়ান সাহেবের আরও স্মরণ করা উচিত, গত তিনশো বছরে ইয়োরোপের সব দেশে সমৃদ্ধি কতগুণ বেড়েছে, অথচ তাঁর নিজেরই হিসাব অনুসারে তিনি

বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে আকবরের যুগের তুলনায় আজকের ভারতবাসীদের আয় প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে গেছে,—বাড়েওনি, কমেওনি।

১৯১৮ সালে সরকারী শিল্প-কমিশনের রিপোর্টের প্রথমেই ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে ভারতবর্ষের শিল্পবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। "আধুনিক শিল্পব্যবস্থার জন্মস্থান পশ্চিম ইয়োরোপে যখন অসভ্যদের বসবাস ছিল, তখনই শাসকদের ঐশ্বর্য ও কারিকরদের শিল্পকৌশলের জন্য ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বহু শতাব্দী পরে যখন পশ্চিমের দুঃসাহসী ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষে প্রথম উপস্থিত হয়, তখনও শিল্পবিকাশের দিক থেকে এদেশ ইয়োরোপের অগ্রগামী জাতিদের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল না।..." ইংরেজ শাসন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে তৎকালীন জগতের মানদণ্ড অনুসারে ভারতবর্ষে যথেষ্ট শিল্পোন্নতি ঘটেছিল ; এ হচ্ছে সর্বত্র স্বীকৃত অবিসম্বাদী সত্য।

আধুনিক বিধানে শিল্পোন্নতির পূর্ণ সম্ভাবনা যে এদেশে ছিল, তাও অকাট্য। শিল্প-কমিশনের সভাপতি, ভারতের খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে প্রধান বিশেষজ্ঞ সার টমাস হলাণ্ড বলেছেন যে—তাম, পিত্তল, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে ভারতবর্ষ বহুদিন অগ্রসর হয়ে রয়েছে। সুতরাং এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে আধুনিক শিল্পব্যবস্থার সংস্থান এদেশে ছিল।

এ ছাড়া সোনা, রূপা, ম্যাঙ্গানিজ্, শিশা, কয়লা, তেল ইত্যাদি ভারতবর্ষে যথেষ্ট আছে। অবশ্য ব্রহ্মদেশ ছিল তেল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র, আর ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি আরও কায়েম ক'রে তেলের মত একটা বিশেষ দরকারী মালের সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া। কিন্তু ভারতবর্ষের নানা জায়গায় যে তেল ভূগর্ভেই রয়ে গেছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সে সব জায়গায় তেল বার ক'রে নেবার ব্যবস্থা হলে যথেষ্ট তেল দেশের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, ১৮৯৪ সালে ভারত সরকারের অর্থনীতি বিশারদ স্যার জর্জ ওয়াট্ লিখেছিলেন যে, পূর্তকার্য বাড়িয়ে আর যানবাহনের সুব্যবস্থা ক'রে কৃষিপদ্ধতি ও প্রকরণের উন্নতি ঘটিয়ে অতি সহজে এদেশের উৎপাদিকাশক্তি অন্তত দেড়গুণ বাড়ানো যেতে পারে। তখন থেকে উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার উপায় অনেক বেশি উন্নত হয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষিজীবিরা 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' রয়ে গেছে।

ভারতের ভূতত্ত্ববিভাগের বড়কর্তা স্যার এড্উইন্ প্যাস্কো ১৯৩১ সালে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে এদেশে প্রভূত কয়লা—প্রায় ৩৬০০ কোটী টন—মজুদ আছে; আর ইস্পাত তৈরীর জন্য বিশেষ দরকারী ম্যাঙ্গানিজ ধাতু পৃথিবীতে যত উৎপন্ন হয় তার একতৃতীয়াংশ ভারতবর্ষ সরবরাহ করতে পারে।

১৯২৯ সালে ভূতত্ত্ববিভাগের উচ্চকর্মচারী সিসিল জোনস্ হিসাব করেছিলেন যে, অসংস্কৃত লৌহ এদেশে যত আছে, এর চেয়ে বেশি পাওয়া যায় একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং ফ্রান্সে। ডক্টর রজনীকান্ত দাস "The Industrial Efficiency of India" পুস্তকে দেখিয়েছেন যে, এই সম্পদের ব্যবহার প্রায় হয় না বললেই চলে; অগ্রগামী দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এর প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ অপচয় হয়ে থাকে। অনেক সময় বলা হয় যে কাছাকাছি কয়লার খনি না থাকার দরুণ অসংস্কৃত লৌহকে সংস্কৃত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ভূতত্ত্ববিভাগের বড়কর্তা ডক্টর সিরিল ফক্স্ দেখিয়েছেন যে, কলকাতা থেকে ২০০ মাইল দক্ষিণ আর ৪০০ মাইল পশ্চিমের মধ্যে প্রায় ২০০০ কোটী টন উৎকৃষ্ট অসংস্কৃত লৌহ পাওয়া যায়। আর এখান থেকে ১২৫ মাইলের মধ্যে অনেক কয়লা খনিও রয়েছে। ভূতত্ত্ববিভাগ থেকে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে, টাকার টানাটানির দরুণ ভাল ক'রে খনিজদ্রব্যের সন্ধান তারা করতে পারে না। ডক্টর সিরিল ফক্স্

সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ববিৎ সম্মেলনে গিয়ে এ বিষয়ে সোভিয়েট ভূতত্ত্ববিদ্‌দের প্রতি সরকারের আনুকূল্য লক্ষ্য করেছিলেন; এদেশে অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাও একাধিকবার বলেছেন। সুতরাং এখন আমরা এদেশের খনিজসম্পদের যে হিসাব পাই তা একেবারেই সম্পূর্ণ নয়, ভারতবর্ষের যে ঐশ্বর্য ভূগর্ভে প্রোথিত রয়েছে তার পরিমাণ এখনও হয়নি। কিন্তু সামান্য যা হয়েছে, তা থেকেই সরকারী ভূতত্ত্ববিভাগ বলতে পারে যে বর্তমান লোহা-ইস্পাতের কারখানাগুলিকে অনেক বেশি বাড়ানো সম্ভব। যাকে বলা হয় Key Industries—সেই মৌলিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন এখনই এদেশে সম্ভব।

জলের শক্তি দিয়ে যন্ত্র চালাবার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সর্বত্র হতে পারে, সর্বত্র কারখানা বসিয়ে দেশের সম্পদকে বহুগুণ বর্ধিত করা যেতে পারে। একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ভারতবর্ষের মতো এত বেশি water power নেই। অথচ এখানে তার ব্যবহার করা হয় শতকরা মাত্র তিন ভাগ, সুইট্‌জারল্যাণ্ডে হয় শতকরা ৭২ ভাগ, জার্মানীতে শতকরা ৫৫ ভাগ, ইতালীতে ৪৭ ভাগ, ফ্রান্সে ও জাপানে ৩৭ ভাগ আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩৩ ভাগ।—টীকা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষিকর্মে ও যন্ত্রশিল্পে ভারতবর্ষ আজ অতি পশ্চাদ্‌পদ, তাই এদেশ এত দীনহীন আমাদের দেশের অপরিসীম প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে অবহেলা করা হয়েছে ব'লেই আজ এই অবস্থা। এর জন্য দায়ী হচ্ছে নিশ্চয়ই এদেশের বিদেশী শাসনব্যবস্থা। ভারতবর্ষের আছে অতুল সমৃদ্ধি, আর ভারতবাসীদের আছে অন্নবস্ত্রের অনটন—ইতিহাসের এই পরিহাসের কারণ কী?

ভারতবাসীর জনপ্রতি বার্ষিক আয় কত? এ প্রশ্নের উত্তর একেবারে নির্ভুল ভাবে দেওয়া এখনও সম্ভব নয়। কিন্তু ১৮৬৮ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আমাদের বার্ষিক আয়ের হিসাব করার চেষ্টা কয়েকবার হয়েছে। এই

হিসাব গুলির তারিখ বিশেষ মনে রাখা দরকার, কারণ ইতিমধ্যে জিনিষপত্রের দামে অনেক অদলবদল হয়েছে। পুরোণো হিসাবের মধ্যে কয়েকটার কথা অনেকেই জানেন। ১৮৬৮ সাল সম্বন্ধে দাদাভাই নওরোজী হিসাব করেছিলেন, আমাদের জনপ্রতি বার্ষিক আয় ছিল কুড়ি টাকা। ১৮৮২ সালে সরকারী উদ্যোগে ব্যেরিং (যিনি পরে হয়েছিলেন লর্ড ক্রোমার) এবং বারবুর হিসাব করেছিলেন, জনপ্রতি আয় ছিল ২৭ টাকা। ১৮৯৯ সম্বন্ধে ডিগ্‌বি সাহেবের হিসাব ছিল ১৮ টাকা। ১৮৯৭-৯৮ সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড কার্জন বলেছিলেন যে, ভারতবাসীদের জনপ্রতি বার্ষিক আয় হচ্ছে ৩০ টাকা। প্রায় একশো বছর ইংরেজ রাজত্বের পর এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে বড় বড় রাজকর্মচারীর মুখ থেকেই এরকম স্বীকারোক্তি মিলেছে।

১৯১১ সাল সম্বন্ধে সরকারী শিক্ষাবিভাগের অধ্যাপক ফিণ্ড্‌লে শিরাজ বার্ষিক আয় হিসাব করেছিলেন ৪৯ টাকা। ১৯১২-১৩ সম্বন্ধে বে-সরকারী অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও জোশীর হিসাব অনুসারে আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৪৷৷৹ টাকা। ১৯২১-২২ সম্বন্ধে অধ্যাপক শা ও খাম্বাটা হিসাব করেন ৭৪ টাকা। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, ১৯০০ সালের তুলনায় ১৯১২ সালে জিনিষপত্রের দাম শতকরা প্রায় ২৫ টাকা বেড়েছিল, এবং ১৯১২ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে আরও প্রায় ডবল বেড়েছিল। আবার ১৯৩১ থেকে দাম কমতে থাকে এবং ক্রমে ১৯৩৬ সালে ১৯১২ সালের যে-রকম অবস্থা ছিল তার কাছাকাছি গিয়ে পড়ে।

সাইমন কমিশন অনেক চেষ্টার পর স্থির করেছিল যে, ১৯২১-২২ সালে এদেশের জনপ্রতি বার্ষিক আয় ছিল ১১৬ টাকা। অর্থনীতিবিদ্‌রা বলেন যে, এ হিসাবে অনেক গলদ আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের হয়ে প্রাণপণে ওকালতি করতে গিয়েও সাইমন কমিশন যে-হিসাব করেছিল, তা থেকে এই দাঁড়ায় যে এদেশের লোকের দৈনিক আয় ১৯২১-২২ সালে ছিল বড় জোর

পাঁচ আনা। তখন থেকে ১৯৩৬ এর মধ্যে কৃষিজ দ্রব্যের দাম প্রায় অর্ধেক পড়ে যায়; সুতরাং ১৯৩৬-এর হিসাবে ঐ পাঁচ আনা দাঁড়াবে দশ পয়সায়।

আরও মনে রাখতে হবে যে, এ হিসাব হচ্ছে গড়পড়তা। এদেশ থেকে ইংরেজ ধনিকদের খাটানো মূলধনের সুদ, কলকারখানায় বিদেশী অংশীদারদের লভ্যাংশ, বড় বড় ব্যাঙ্ক আর হৌসের মুনাফা ইত্যাদি অবশ্য বেরিয়ে যায়, কিন্তু সে সব টাকা এদেশের লোকে না পেলেও এ হিসাবে ধরা হয়েছে। তাছাড়া ভারতবাসীদের মধ্যেই আয়ের বিষম তারতম্য রয়েছে। "Wealth & Taxable Capacity of India" পুস্তকে শা ও খাম্বাটা দেখিয়েছেন যে, এদেশের শতাংশের মাত্র একাংশ লোক পায় দেশের মোট আয়ের একতৃতীয়াংশ; লোকসংখ্যার তিন-পঞ্চমাংশ পায় মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও ও অল্প। সুতরাং জনসাধারণের গড়পড়তা আয় উক্ত হিসাবের চেয়ে অনেক কম হতে বাধ্য। সাইমন কমিশনের হিসাব অনুসারে বিলাতের জনপ্রতি বার্ষিক আয় ১৩৯২ টাকা; সুতরাং যে শ্রমিক-পরিবারে আছে স্বামী-স্ত্রী আর তিনটী পুত্র-কন্যা তার আয় হওয়া উচিত ৬৯৬০ টাকা। অথচ আসলে দেখা যায় যে অধিকাংশ শ্রমিক-পরিবারের ভাগ্যে ঐ সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশও জোটে না। এ অবস্থায় আমাদের দেশের জনসাধারণের আয় হিসাব মাফিক যে নয়—তা সহজেই বোঝা যাবে।

১৯২৮ সালে ভারতবাসীদের বার্ষিক জনপ্রতি আয় সম্বন্ধে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির হিসাব ছিল ৪২ টাকা। ১৯৩৮ সালে অর্থসচিব সার জেম্‌স গ্রিগের মতে আয় ছিল জনপ্রতি ৫৬ টাকা। অধ্যাপক শা এবং খাম্বাটার কথায় এর অর্থ হচ্ছে এই যে, শুধু দিনে দু'বার অন্নগ্রাস এ আয়ে চলে বটে কিন্তু বস্ত্র মেলে না, আচ্ছাদন মেলে না, আমোদ-প্রমোদ তো মেলেই না—আর যে-অন্ন মেলে তা হচ্ছে সবচেয়ে দীনহীন ও সব চেয়ে কম পুষ্টিকর।

১৯৩৫ সালে ইংরেজ সরকার জেলের কয়েদীদের খাবারের জন্য খরচ করেছিল গড়ে ১০৫ টাকা ;—অর্থাৎ সরকারী হিসাবে এদেশের চাষীদের যা আয় তার আড়াই গুণেরও বেশি। বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের অবস্থা চাষীদের চেয়ে ভাল, কিন্তু ১৯২৩ সালে তাদের খাওয়ার খরচের যে এক সরকারী হিসাব নেওয়া হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে কয়েদীদের খাওয়ার খরচ তার চেয়ে বেশি।

এ পর্যন্ত প্রায় কেবল সরকারী হিসাবেই উধৃত করা হয়েছে। এবার ইংরেজ ব্যবসাদারদের হিসাব দেখা যাক। তাদের হিসাবে বেশি ভুল থাকা উচিত নয়, কারণ তারা নিজের লাভের জন্য কোথায় কত খরিদ্দার আছে তা জানতে চায়, আর যত্ন ক'রেই খোঁজ-খবর নেয়। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডন টাইম্‌সের একটা Trade and Engineering India Supplement প্রকাশিত হয়েছিল। এতে দেখা যায়, ব্যবসাদারদের হিসাবে এদেশে প্রায় ৬০০০ পরিবার আছে যাদের বার্ষিক আয় হচ্ছে লক্ষ-টাকার উপর ; ২,৭০,০০০ পরিবারের বার্ষিক আয় হচ্ছে ৫০০০ টাকা ; ২,৫০,০০০ পরিবারের বার্ষিক গড়পড়তা আয় হচ্ছে ১০০০ টাকা ; সাড়ে-তিনকোটি পরিবারের বার্ষিক গড়পড়তা আয় ২০০ টাকা ; আর বাকী অন্যান্য পরিবারের বার্ষিক গড়পড়তা আয় মাত্র ৫০ টাকা।

বার-বার বহু সরকারী রিপোর্টে স্বীকারোক্তি রয়েছে যে এদেশের অধিকাংশ লোকের সামান্য অন্নবস্ত্রেরও সংস্থান নেই। সরকারী চিকিৎসা-বিভাগের বড়কর্তা সার্ জন্ মেগ্ ১৯৩৩ সালের রিপোর্টে বলেছিলেন যে, এখানকার লোক সংখ্যার শতকরা মাত্র ৩৯ জন একরকম ভাল খেতে পায় ; বাংলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়, তাই এখানে ভাল খেতে পায় মাত্র শতকরা ২২জন।

অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই—এই হচ্ছে আমাদের দেশের জন-

সাধারণের অবস্থা। ভারতবর্ষের যেসব যায়গায় কারখানা বসেছে, খনি খুঁড়ে ধনিকের শ্রীবৃদ্ধির ব্যবস্থা হচ্ছে, সেখানেই মজদুরদের দুর্দশার সীমা নেই। ১৯৩১-এর আদমসুমারিতে দেখা যায় যে বোম্বাই শহরের জনসংখ্যার শতকরা ৭৪ জনের মাথা গুঁজবার যায়গা ছিল মাত্র একখানি ঘর। কিছুকাল আগে এক সরকারী হিসাব অনুসারে দেখা গিয়েছিল, বোম্বাইয়ের মজদুরদের মধ্যে শতকরা ৯৭ জন এক-ঘর বাসায় থাকে, প্রায়ই এক ঘরে দুই পরিবার বাস করে, কখনও কখনও ৭।৮টা পরিবারও একত্র একটামাত্র ঘরে থাকতে বাধ্য হয়। করাচী, আহ্‌মদাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, ঝরিয়া, হাওড়া, কলকাতার শহরতলী আর বস্তী সর্বত্রই ঐ একই অবস্থা। দরিদ্রনারায়ণের সেবা এই ভাবেই এদেশে হয়ে এসেছে।

বোম্বাইয়ের সরকারী 'লেবর গেজেটে' ১৯২২ এর সেপ্টেম্বরে এক লেডী ডাক্তারের বিবৃতি প্রকাশ হয়েছিল। তা থেকে এইটুকু উধৃত করলেই যথেষ্ট হবে "একটা 'চলের' তিনতলায় দীর্ঘে ১৫ আর প্রস্থে ১২ ফুট এক ঘরে আমি দেখলাম যে, ছ'টা পরিবার একত্র বাস করছে। আমার খবর যে ভুল নয় তার প্রমাণ এই যে, ঘরে ছ'টা আলাদা উনান ছিল। প্রশ্ন ক'রে জানলাম, ঐ ঘরে বাস করে সর্বসমেত ৩০ জন প্রাণী। যে-ছ'জন স্ত্রীলোক ঐ ঘরে বাস করত, তাদের মধ্যে তিনজনের তখন সন্তান সম্ভাবনা লক্ষ্য করলাম। শুনলাম যে ঐখানেই নাকি প্রসবের ব্যবস্থাদি করতে হবে। চট্ ঝুলিয়ে প্রত্যেক পরিবার নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা ক'রে থাকে।"

এই হচ্ছে যে-দেশের অবস্থা সেখানে-যে যমরাজের প্রকোপ খুবই— তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষে মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ২৩·৬; বিলাতে প্রায় তার অর্ধেক, ১২·৩।

শিশুমৃত্যুর হার সারা ভারতবর্ষে হাজারকরা ১৬৪; বিলাতে মাত্র ৫৭। শহরের অবস্থা এ বিষয়ে গ্রামের চেয়েও খারাপ। কলকাতা শহরে একবৎসর

বয়স হবার আগে হাজারকরা ২৩৯টী শিশুর মৃত্যু ঘটে, বোম্বাইয়ে ২৪৮, মাদ্রাজে ২২৭। গরীবদেব প্রতি যমরাজের-যে বিশেষ পক্ষপাত, তার প্রমাণ এই যে, বোম্বাই শহরে যারা একটী ঘরে বাস করে তাদের মধ্যে শিশুমৃত্যুব হার হাজাবকরা ৫৭৭, যারা দুটো ঘর নিয়ে আছে, তাদের মধ্যে ২৫৪; আব হাসপাতালে ব্যবস্থা ভাল ব'লে হার হচ্ছে ১০৭।

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ-ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬৬ লক্ষ। তার মধ্যে ৩৮ লক্ষেব বেলায় মৃত্যুর কাবণ দেওয়া আছে—জ্বর। এই জ্বব, কিম্বা বসন্ত, কলেবা, প্লেগ ইত্যাদিব আসল কাবণ হচ্ছে দাবিদ্র্য। স্থিরধী পণ্ডিতেরাই একথা বলছেন, হুজুগকারীরা নব।

এই দাবিদ্র্যেব প্রকোপ দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে আজকের তুলনাব ৩০।৫০ বৎসব পূর্বেব অবস্থা যে ভাল ছিল, তা অনেকেই ব'লে থাকেন। ১৯২৭ ২৮ সালে বাংলায় স্বাস্থ্যবিভাগের বডকর্তা ডাক্তাব বেণ্ট্‌লী বলেছিলেন যে, বাংলায় চাষীরা যা খায তাতে একটা ইঁদুব পাঁচ হপ্তা বাঁচে কিনা সন্দেহ, আব এই কারণে নানারকম ব্যারামকে প্রতিবোধ করার শক্তি তাদেব নেই। ১৯৩৩ সালে সারা ভাবতবর্ষ সম্পর্কে সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে এই কথাই বলা হয়েছিল।

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা দেশের এই অবস্থা—সমাজ ও বাষ্ট্রের মৌলিক বিপ্লবী পবিবর্তন বিনা কি এ সমস্যার সমাধান আছে?

ভারতের লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য

প্রায় শোনা যায় যে, এদেশের লোক অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন সম্বন্ধে অজ্ঞ কিম্বা উদাসীন। আর জাতিভেদ, অবরোধ-প্রথা প্রভৃতি সমাজের অগ্রগতিকে রোধ ক'রে আছে। সুতরাং আমরা-যে গরীব তাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু দারিদ্র্যের আনুষঙ্গিক ব্যাপারকে তার মূল কারণ মনে করা-যে বিষম ভুল, তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমরা এত গরীব, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা পরাধীন আর অর্থনীতির দিক থেকে বেজায় পিছিয়ে থাকতে বাধ্য রয়েছি। আমাদের দেশের জনসাধারণ সরকারের কাছ থেকে শিক্ষার সুযোগ না পেলে দোষ জনসাধারণের ঘাড়ে চাপানো ঠিক হতে পারে না। যে দেশের সর্বত্র নিদারুণ দারিদ্র্য, সেখানে জনসাধারণকে স্বাস্থ্যরক্ষা আর আত্মোৎকর্ষ সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ দিয়ে উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছে একটা হাস্যকর ব্যাপার। সাম্রাজ্যতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় জমিদারী-পুঁজিদারী-ব্যবস্থা দেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে রয়েছে, তার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে এ দারিদ্র্যের অবসান ঘটতে পারে না। রুষ সাম্রাজ্যে জারের আমলে জনসাধারণ দারিদ্র্য প্রপীড়িত অবস্থায় কোনক্রমে আমাদের মতোই দিন গুজরাণ করত। কিন্তু মজদুর-চাষী মিলে সেখানে নিজেদের শাসন—যথার্থ স্বরাজ—প্রবর্তন করার পর থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পোন্নতিতে যে উন্নতি হয়েছে, তার তুলনা ইতিহাসে মেলে না। আমরা

স্বাধীন নই, আমাদের সমাজ অচলায়তন হয়ে থাকুক, এই হচ্ছে আমাদের শাসকদের লক্ষ্য ; আমাদের স্কন্ধে রয়েছে জমিদারী-পুঁজিদারীর দুর্বহ বোঝা, বিদেশী শাসন আমাদের এগিয়ে যাবার পথ রোধ ক'রে রয়েছে, তাই এত বিড়ম্বনা আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে। এগিয়ে যাবার স্বাধীনতা থাকলে আমরা কখনই এত পিছিয়ে থাকতে পারতাম না—তাই মুক্তি-আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনই আমাদের ভবিষ্যতের ভরসা।

অনেক অর্থনীতিবিশারদ্ অবশ্য ব'লে থাকেন, স্বাধীনতার প্রসঙ্গকে এদেশের দারিদ্র্য সমস্যার আলোচনায় প্রায় অবান্তর বলা চলে। তাঁদের মত হচ্ছে এই যে, এদেশের লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে গেছে ব'লেই আমরা এত গরীব। এই কথা বার-বার শুনে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই এ মিথ্যা যুক্তিতে বিশ্বাস ক'রে থাকেন। তাই বিশেষ ক'রে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রজা-বৃদ্ধিকে দারিদ্র্যের কারণ ব'লে প্রথম প্রচার করেছিলেন পাদ্রী ম্যাল্‌থস। তাঁর বই বেরিয়েছিল ১৭৯৮ সালে, ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছিল, তাকে দূর করাই তাঁর মতলব ছিল। পাদ্রী সাহেবের পুরস্কার মিলেছিল, যখন তাঁকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে বহুলোকের মৃত্যু না ঘটলে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র্যের প্রকোপ অবশ্যম্ভাবী—এই ছিল পাদরী সাহেবের মোটামুটি বক্তব্য। বলা বাহুল্য যে, এই মতকে ইংরেজ বড়লোকেরা সানন্দে লুফে নিয়েছিল। ঐ সময় শিল্প কার্যে যন্ত্র প্রচলনের ফলে উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু বিলাতের গরীবরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেল, আর বড়লোকদের ঐশ্বর্য বাড়তে থাকল। সুতরাং এ অবস্থায় বড়লোকরা নিজেদের বিবেককে এই ব'লে সান্ত্বনা দিতে পারল যে, ম্যালথসের মত

অনুসারে দারিদ্র্যের তো একটা বাঁধাধরা কারণই রয়েছে। গরীব মজুর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে ধনসম্পদ তৈরী করল, তাকে আত্মসাৎ করতে বড়লোকদের সংকোচ রইল না।

ম্যাল্‌থস মনে করেছিলেন যে, কিছুতেই শিল্পোৎপাদন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। কিন্তু উনিশ শতকের অভিজ্ঞতা থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হ'ল যে, যন্ত্র প্রচলনের ফলে লোকসংখ্যার চেয়ে ধনসম্পদ বহু গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। গত মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী অর্থনৈতিক সংকটের সময় আবার দেখা গেল, ঐ দারুণ ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল ও শিল্প-পণ্যের উৎপাদন পৃথিবীর লোকসংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশি হয়েছিল। তাই যেন ম্যাল্‌থস্‌কে বিদ্রূপ ক'রেই রব উঠল যে, ইউরোপ-আমেরিকাতে শিল্পোৎপাদন অতিরিক্ত হয়ে গেছে। (যদিও সেখানকার গরীবদের অবস্থা শোচনীয় থেকেই গেল)—সুতরাং শিল্পোৎপাদনের চেয়ে শিশু উৎপাদনই কাম্য! এর কারণ হচ্ছে এই, সব দেশের শাসকরা বুঝেছিল যে, ধনিক রাষ্ট্রগুলির পরস্পর বিরোধের ফলে মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তাই সেই যুদ্ধের জন্য লোকসংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন। তাই শিল্পোৎপাদনের সংকোচ ঘটিয়ে প্রজাবৃদ্ধির প্রচারকার্য ইয়োরোপ-আমেরিকাতে কিছুকাল পুরোদমে চলে এসেছে।

পাশ্চাত্যে অগ্রাহ্য হয়ে তাই ম্যাল্‌থসের মতবাদ এশিয়াতে আশ্রয় নিয়েছে। বিশেষ ক'রে ঐ মত অনুসারে ভারতবর্ষ ও চীনের দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের উপায় বাৎলানো হয়েছে, লোকসংখ্যা কমাতেই হবে শোনা যাচ্ছে। আমাদের দারিদ্র্যের দায়িত্ব নাকি সরকারের ঘাড়ে চাপানো অন্যায়, কারণ ইংরেজ শাসনের কল্যাণে বুঝি এদেশ থেকে অন্তর্যুদ্ধ দূর হয়েছে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির প্রকোপ খুবই কমেছে। আর তাই প্রজাবৃদ্ধির উপর যে "স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক" ছিল তা অপসৃত হচ্ছে ব'লে

কাণ্ডজ্ঞানহীন ভারতীয়দের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দারিদ্র্য দুর্বাররূপে দেখা দিচ্ছে। একথা বলার সময় খোস্ মেজাজে ভুলে যাওয়া হয় যে, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দর্শক পর্যন্ত এদেশে যে-রকম দুর্ভিক্ষ হয়েছে, ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া ভার। আরও ভুলে যাওয়া হয় যে, অধিকাংশ ভারতবাসীকে আজও অর্ধাশনে-অনশনেই থাকতে হয়, আর শীর্ণদেহে রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি নেই ব'লেই ১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জাতে প্রায় দেড় কোটি ভারতবাসীর মৃত্যু হয়েছিল। যাই হোক, নির্বোধ ভারতবাসী সভ্য ইয়োরোপীয়দের মতো জন্মনিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আয়ত্ত না করতে পারলে মহানুভব ইংরাজ সরকারের পরম কল্যাণকর শাসন সত্ত্বেও এদেশের দারিদ্র্য বেড়ে চলবে—আর সেজন্য দায়ী নাকি আমাদেরই মূঢ়তা।

তাই দেখা যায় যে, প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ শ্রীমতী অ্যানষ্টে তাঁর 'Economic Development of India' (পৃঃ ৪৭৫)-তে নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেছেন: "কোথায় সেই ভারতীয় ম্যালথস্, যিনি ভারতের প্রবল শিশুবন্যাকে ধিক্কার দেবেন, ব্যাহত করবেন?" অনেকে এমন কথাও বলতে আরম্ভ করেছেন যে, এশিয়ার দারিদ্র্য দূর করার উপায়ই হচ্ছে 'বার্থ কন্ট্রোল' (জন্মনিয়ন্ত্রণ)। ১৯৩১ সালে সরকারী হুইটলে কমিশন শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে রিপোর্ট দিলেন যে, ম্যালথসের কথা এদেশে রীতিমতো খাটে, আর দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, লোকসংখ্যার আধিক্য। সকলেই এক তালে সুর দিলেন, সকলেই বোঝাতে লাগলেন, আমাদের দারিদ্র্যের কারণ সাম্রাজ্যতন্ত্র নয়, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা নয়, যত বিপদের মূল হ'ল অতিরিক্ত প্রজাবৃদ্ধি।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ কথা বিদেশী শাসন ও ধনিক ব্যবস্থাকে কায়েম করার যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা যদি ইংরাজ রাজত্বের যুগ কিম্বা গত ৫০ বৎসরের অবস্থা আলোচনা করি তো স্পষ্টই দেখা যাবে, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ইয়োরোপের প্রায় যে-কোনো দেশের চেয়ে যথেষ্ট কম।

১৮৭২ সালের আগে এদেশে আদমসুমারীর বন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং লোকসংখ্যা সম্বন্ধে ১৮৭২ সালের পূর্বে আনুমানিক হিসাব ধরতে হবে। 'India at the death of Akbar' গ্রন্থে (পৃঃ ২২) সিভিলিয়ান মোরলণ্ড সাহেব হিসাব করেছেন যে, আকবরের মৃত্যু সময়ে এদেশের লোকসংখ্যা ছিল ১০ কোটী। ১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুসারে লোকসংখ্যা হ'ল ৩৫ কোটী ৩০ লক্ষ। অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক তিনশো বৎসরে লোকসংখ্যা সাড়ে-তিনগুণ বেড়েছে। ১৭০০ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা ছিল ৫১ লক্ষ, এখন হচ্ছে ৪ কোটীর কিছু বেশি; অর্থাৎ তিনশো বৎসরের চেয়ে কম সময়ে বিলাতের লোকসংখ্যা আটগুণ বেড়েছে।

অধ্যাপক কার সাণ্ডার্সের প্রামাণ্য গ্রন্থ "World Population past growth and present trends"এ দেখা যায় যে, ১৬৫০ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে সারা দুনিয়ার লোকসংখ্যাতে ইয়োরোপের ভাগ বেড়েছে শতকরা ১৮·৩ থেকে ২৫·২, আর এশিয়ার ভাগ কমেছে শতকরা ৬০·৬ থেকে ৫৪·৫। বুর্জোয়া সভ্যতার যুগে এশিয়াতে লোক কমেছে আর ইয়োরোপেই বেড়েছে—অথচ সাধারণত: সকলের ধারণা ঠিক এর বিপরীত।

১৮৭০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে নানা দেশের লোকসংখ্যা কী অনুপাতে বেড়েছে, তার একটা হিসাব দেখা যাক ঃ

দেশ	বৃদ্ধির শতকরা হার
ভারতবর্ষ	১৮·৯
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স	৫৮·০
জার্মানী	৫৯·০

দেশ	বৃদ্ধির শতকরা হার
বেলজিয়ম	৪৭.৮
হল্যাণ্ড	৬২.০
রুষদেশ	৭৩.৯
ইয়োরোপ মহাদেশ (গড়ে)	৪৫.৪

(ব্রজনারায়ণ, "Population of India" পৃঃ ১১)

ফ্রান্স ছাড়া যে-কোনো ইয়োরোপীয় দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম।

১৮৮১ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটী ৬০ লক্ষ, ১৯৩১-এ প্রায় ৪ কোটী। ঐ সময়ে ভারতের লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাড়ে ২৫ কোটী থেকে ৩৫ কোটীর কিছু বেশী। কিন্তু আবার ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ভারতের আয়তনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই আদমসুমারীর কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, এদেশে ঐ সময়ে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩১.৭—অর্থাৎ গত ৫০ বৎসরে বিলাতের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার এদেশের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

কেবল ১৯২১-৩১-এ এদেশের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার (শতকরা ১০.৬) ইংলণ্ড ও পশ্চিম ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু তখনও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৪.২, আর সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৭.৯। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিকে দারিদ্র্যের মূল বলা মূঢ়তাই হবে, কারণ আশা করা যায়, সকলেই স্বীকার করবেন যে, ১৯২১ থেকে ভারতের দারিদ্র্যকাহিনী আরম্ভ হয়নি।

১৯৩১ সালে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কমিটির রিপোর্টে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সরকারী কমিটি হলেও এর সভ্যেরা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, লোকসংখ্যাধিক্যকে দেশের দারিদ্র্যের

কারণ ব'লে যে প্রচার চলে, তা একেবারে ভুল। ঐ রিপোর্টের ৪০-৪১ পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে যে, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে ১২'১৭, ১৯০১-১১তে ১০'৯১, আর ১৯১১-২১তে ৪'৮; কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে ঐ সময়ে হার ছিল যথাক্রমে ২'৪, ৫'৫ ও ১'৩।

১৯৩১ সালের হিসাবে সারা ভারতবর্ষের প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ছিল গড়ে ১৯৫; বিলাতের অনুরূপ হিসাব হচ্ছে ৬৮৫, বেলজিয়মে ৭০২, হল্যাণ্ডে ৬৩১ আর জার্মানীতে ৩৪৮। এ হচ্ছে অবশ্য সারা দেশ নিয়ে গড়-পড়তা হিসাব। কিন্তু ভারতবর্ষের যে প্রদেশে আয়তনের অনুপাতে লোক-সংখ্যা সব চেয়ে বেশী, সেই বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে অধিবাসীর সংখ্যা হচ্ছে ৬৪৬, অর্থাৎ বিলাত আর বেলজিয়মের চেযে কম। বাংলার কোনো কোনো জেলায় অবশ্য বসতি খুবই ঘন-সন্নিবিষ্ট; যেমন দেখি, ঢাকায় প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১২৬৫, ত্রিপুরায় ১১৯৭ কিম্বা ফরিদপুরে ১০০৩ জন অধিবাসী থাকে। কিন্তু ১৯৩১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে বাংলা দেশ সম্বন্ধে এই আলোচনার শেষে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, এখানে চাষের জমিতে উন্নত উপায়ে উৎপাদনের ব্যবস্থা হলে অতি সহজে বর্তমান লোকসংখ্যার দ্বিগুণ প্রতিপালিত হতে পারে।

এখন কথা উঠবে যে, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার বিশেষ ভীতিকর না হলেও প্রজাবৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। একথা কিন্তু সত্য নয়। অবশ্য এদেশের কৃষিব্যবস্থা মান্ধাতার আমলে যা ছিল এখনও তাই: আমাদের বর্তমান শাসকরা তার উন্নতি না ঘটিয়ে এবিষয়ে নিদারুণ অবহেলাই দেখিয়ে এসেছেন। আমরা যদি সভ্য মানুষের মতো থাকতে চাই তো তার ব্যবস্থা এখনও এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু এ শোচনীয় পরিস্থিতির কারণ লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি নয়, কারণ হচ্ছে উৎপাদনের আদিম ব্যবস্থা, জমিদারী-

পুঁজিদারী হুকুমৎ আর তার আশ্রয় ও অবলম্বন বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র। সে যাই হোক, এখনো এদেশে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির চেয়ে খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধির হার বেশি আছে।

১৮৯১ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে লোকসংখ্যা বেড়েছিল শতকরা ৯.৩। ঐ সময়ে শস্যোৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমিও বেড়েছে, আর তার হার হচ্ছে শতকরা ১৯, অর্থাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারের দ্বিগুণ।

১৯২১-৩১এ লোকসংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই দশ বৎসর সম্বন্ধে মাদ্রাজের অধ্যাপক পি, জে, টমাস্ সযত্নে হিসাব ক'রে "Population and Production" (১৯৩৫)এ দেখিয়েছেন যে, তখন লোকসংখ্যা বেড়েছিল শতকরা ১০.৪, কৃষি-উৎপাদন বেড়েছিল শতকরা ১৬, আর শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল শতকরা ৫১। ম্যাল্থসের অনুরাগী শিষ্য অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও তাঁর "Food Planning for Four Hundred Millions" (১৯৩৮) গ্রন্থে বহু তথ্য আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছেন।

লণ্ডন "টাইমসে" অধ্যাপক টমাস্ ১৯৩৫-এর ২৪শে অক্টোবর তারিখে একটি বিস্তৃত পত্রে লিখেছিলেন: "১৯০০ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১৯; তখন খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা প্রায় ৩০, আর শিল্পোৎপাদন বেড়েছে শতকরা ১৮৯। ১৯২১-৩০এ লোকসংখ্যা খুব দ্রুত বেড়েছে বটে, কিন্তু তখনও উৎপাদন সে বৃদ্ধির তালে পা রেখে যেতে পেরেছে। সুতরাং উৎপাদনের তুলনায় যে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বেড়েছে, তা বলা চলে না। যাঁরা এদেশের 'পুত্র-কন্যার প্রবল বন্যা' দেখে ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়েছেন, তাঁরা দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি ও অনুরূপ ব্যাপারে মনোযোগ দিলেই ভাল করবেন।"

এসব কথা পণ্ডিতরাই অকাট্য তথ্য সংগ্রহ ক'রে বলছেন।

অবশ্য কেউ যেন মনে না করেন যে, বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি ভারত-বাসীদের জীবনযাত্রার পক্ষে যথেষ্ট। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, আমাদের খাদ্য, দুগ্ধ ইত্যাদির উৎপাদন, এদেশবাসীর যথার্থ যা প্রয়োজন, তার চেয়ে রীতিমতো কম। কিন্তু তার কারণ হচ্ছে এই যে, বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এদেশের বিপুল সম্পদের পূর্ণ বিকাশ একেবারে অসম্ভব। আমাদের প্রকৃতিদত্ত সম্পদকে জনহিতার্থে ব্যবহার করতে পারলে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি লোকের সভ্য জীবনযাত্রার সংস্থান সহজেই সম্ভব। কিন্তু এখনকার অবস্থায় তার কোনো আশা নেই।

বর্তমান সমাজ ও শাসনব্যবস্থার যাঁরা সমর্থক, লোলুপ সাম্রাজ্যতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় পুঁজিদার-জমিদারের অবাধ প্রভুত্বকে যাঁরা ঈশ্বরের অকাট্য বিধান মনে করতে চান, তাঁরাই প্রচার ক'রে থাকেন যে, এদেশের দারিদ্র্যের মূলগত কারণ হচ্ছে এখানকার লোকসংখ্যা, তাঁরাই ভারতীয় ম্যাল্‌থসের আবির্ভাবের আশায় হা-হুতাশ করেন, তাঁরাই 'ভারতীয় পুত্রকন্যার প্রবল বন্যার' গতিরোধের জন্য চীৎকার করেন। এই দলের একজন প্রধান প্রতিনিধি শ্রীমতী অ্যান্‌ষ্টে তাঁর "Economic Development of India" (পৃঃ ৪০)-তে লিখেছেন: "একথা শোনা যায় যে, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা অতিরিক্ত নয়, এমনকি দেশের উৎপাদন ও সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারলে আরও বহু লোকের সংস্থান ভারতবর্ষে আছে। অবস্থার উন্নতি ঘটলে যে তা সম্ভব, একথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু বর্তমান অবস্থাতে লোকসংখ্যা কমলে জনপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ সন্তোষজনক হতে পারে।" তাঁর মতো পণ্ডিতেরা-যে কেবল 'বর্তমান অবস্থা' নিয়েই ব্যস্ত আছেন, তার একটা বিশিষ্ট কারণ রয়েছে। বর্তমান অবস্থা হচ্ছে

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবশ্যম্ভাবী ফল, বহুমুখী শোষণপদ্ধতির একমাত্র পরিণাম। পণ্ডিতেরা সাধারণত কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী; তাই কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়া তাঁদের মনোমত নয়। সুতরাং তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ পথ হচ্ছে কেবল 'বর্তমান অবস্থা' নিয়ে মাথা ঘামানো, আর বর্তমান শোচনীয় অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাবার যে-চেষ্টায় গণশক্তি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, ঘৃণাক্ষরে সে চেষ্টাকে সমর্থন না করা। কিন্তু পণ্ডিতেরা যাই বলুন, 'বর্তমান অবস্থা' যে চিরন্তন নয় তা আমাদের জনসাধারণ বুঝেছে, আর যখন সে অবস্থার অবসান তারা ঘটাবে তখন ভারতবর্ষের 'অতিরিক্ত লোকসংখ্যার নামে' অধিকাংশ অর্থনীতিকদের অপপ্রচার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকবে না।

সুখের বিষয় এই যে, আজকাল কয়েকজন খ্যাতনামা অর্থনীতিক ও সংখ্যাশাস্ত্রবিদ ধনিক-সাম্রাজ্যতন্ত্রের সনাতন শ্রেষ্ঠতা মানতে চাইছেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৩৩ সালে লণ্ডন শহরে "এশিয়াতে জন্মসংকোচ" শীর্ষক এক প্রবন্ধের কথা বলা যায়। এটা লিখেছিলেন ডক্টর কুচিনস্কি, ইনি লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। অন্য কথার মধ্যে তিনি বলেন, "আমরা শুনি যে ভারতবর্ষে ২০ কোটী একর জমিতে চাষ হয়, কিন্তু সকল ভারতবাসীর অন্নসংস্থানের জন্য ৩৫ কোটী একর জমিতে চাষ হওয়া দরকার। কিন্তু সত্যি কি তাই? আমরা যদি জমির উর্বরতা বাড়াবার ব্যবস্থা না করি, কৃষির উন্নতির জন্য কোনো চেষ্টাই না করি, তাহলে অবশ্য ৩৫ কোটী একর দরকার। কিন্তু আধুনিক কৃষিকর্ম সম্বন্ধে যার সামান্য মাত্র জ্ঞান আছে, সে জানে যে এই ২০ কোটী একরই সমস্ত ভারতবাসীর প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাকে উন্নত করলে যেমন মৃত্যুর শোচনীয় হারকে কমানো যায়, তেমনি কৃষির উন্নতি করলে সে দেশের খাদ্যের অভাব দূর হতে পারে।" পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে যেখানে ভারতবর্ষের মতো কৃষিকর্মের প্রভূত উন্নতি সহজে সম্ভব। অথচ এদেশেই অতিরিক্ত

লোকসংখ্যার রব তুলে সাম্রাজ্যতন্ত্রের সুপারিশ করা হয়, আর আমরা সেই প্রচারের মোহে ভুলে বসি আর ভাবি যে, সত্যই বুঝি বিদেশী শাসনে দেশে শান্তি এসেছে, একটা স্বাস্থ্যবিভাগ বসেছে, দুর্ভিক্ষ কমেছে। তাই আমাদের লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং এর একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়, জন্মনিরোধের প্রোপাগাণ্ডা খুব চালানো দরকার। আসলে-যে আমাদের দারুণ দারিদ্র্যের কারণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শাসন, আর জমিদার-পুঁজিদারদের অখণ্ড প্রতাপ—আসলে যে আজকের এই ব্যবস্থার দরুণ দেশের অতুল সম্পদ সত্ত্বেও আমরা জীবন্মৃত হয়ে আছি, তা ভুলে যাই।

ইয়োরোপে এদেশের চেয়ে লোকসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সেখানে উৎপাদন-পদ্ধতি সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও অনেকটা উন্নত হয়েছে, তাই তারা সেখানে আর অতিরিক্ত লোকসংখ্যার (Over-population) রব তোলে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফলে আমাদের দেশে অনুরূপ কোনো উন্নতি ঘটেনি; যতদিন সাম্রাজ্যতন্ত্র বর্তমান, ততদিন ঘটতেও পারে না। যদি দেশবাসীর দারিদ্র্য নিরাকরণ আমাদের উদ্দেশ্য হয় তো অর্থনীতি-বিদ্‌দের অবান্তর আলোচনায় না ভুলে দারিদ্র্যের মূল কারণের অবসান ঘটাতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো পথ যে নেই, তা আমাদের বুঝতে হবে।
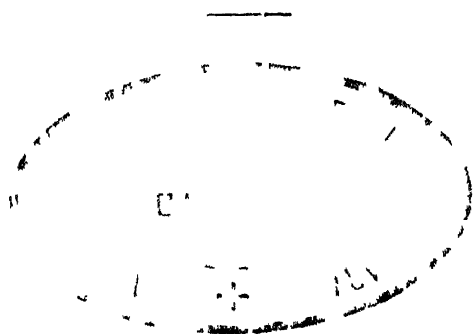
দেশের দুর্গতি ও কর্তাদের কৈফিয়ৎ

প্রায় এগারো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছিলেন :—"আমাদের সম্রাটবংশীয় খ্রীস্টান পাদ্রিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকালটিস্ যে কী-রকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেছেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না—কারণ বিশেষ ক'রে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যবসাগত অভ্যাস, আলো চোখে পড়ে না, বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান্ তাঁদের শাসনচন্দ্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চশমার দরকার করে না।"

ভারতে উন্নতিসাধনের দুরূহতা-যে কত বেশি, সে সম্বন্ধে সরকারী প্রোপাগাণ্ডা বহুকাল থেকে চলে আসছে, আজও তার প্রতিধ্বনি পার্লামেণ্টের কত বক্তৃতায় হরদমই মিলছে। আমরাও ভাবি যে ব্যাপার কঠিন তো বটেই, নইলে আমাদের দশা এমনই বা হবে কেন?

আগেকার জাঁদ্‌রেল ইংরেজরা বেশ জোর গলাতেই বলতো যে এ দেশটার অস্তিত্ব শুধু ভূগোলের পাতায়। ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ, এখানে থাকে নানা জাতি, তাদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা, চিন্তাধারা আলাদা। এদেশ যখন স্বাধীন হতেই পারে না, তখন ইংরেজ শাসন ছাড়া উপায় কী?

এদেশের লোক যখন স্বরাজ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের জাতিসত্তা প্রমাণের চেষ্টা করলো, তখন মহাপ্রভুদের সুর একটু বদলালো। স্বাধীনতার লড়াইকে যখন একদম দাবিয়ে রাখা সম্ভব হ'ল না, তখন তারা আবার

বলতে সুরু করলো যে শুধু ইংরেজ শাসনের গুণেতেই এদেশে একজাতিবোধ দেখা দিয়েছে। অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী কিন্তু সে কথা মেনে নিয়ে ইংরেজ শাসনকে বাহবা দিতে রাজী হ'ল না।

সম্প্রতি পার্লামেণ্টে কয়েকটি বক্তৃতায় এমরি সাহেব ভারতীয় "সমস্যার" দারুণ দুরূহতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। সাইমন কমিশনের বহুল প্রচারিত রিপোর্টে এই দুরূহতার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। রিপোর্ট প্রকাশের মতলবও সহজে হাশিল হয়েছিল। এমনকি সোশালিস্ট কাগজ "নিউ লীডারে" নেভিনসন্ সাহেবের মতো প্রগতিবাদী ব'লে পরিচিত সাংবাদিক লিখলেন যে, যেখানে ৫৬০টি করদরাজ্য আছে, ২২২টি ভাষায় যে দেশের লোক কথা বলে, যেখানে দশকোটি লোক অস্পৃশ্য, সেখানকার উপযোগী শাসনতন্ত্র খাড়া করা প্রায় একরকম অসম্ভব। পাঠকদের তিনি বললেন যে, যারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভাবে, তারা যেন নিশ্চয়ই এ রিপোর্টটি পড়ে ; আর যে পড়েনি, সে যেন ঐ বিষয়ে মুখ খোলার দুঃসাহস না দেখায়। সাইমন কমিশনের বৃত্তান্ত-যে প্রায় বেদবাক্যের সামিল, মোটামুটি এই হ'ল তাঁর কথা। ইংরেজ "সোশালিস্টরাও" এই রিপোর্ট আনন্দে লুফে নিয়ে স্থির করলেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার একেবারেই যখন অযোগ্য, তখন ও-ব্যাপার নিয়ে বৃথা মাথা ঘামানোর দরকার তাঁদের নেই ; দেশটা তাঁবে থাকলে বরং বড়লোকদের মুনাফা থেকে অতি সামান্য কিছু তাঁদেরও পকেটে আসবে।

এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরী করতে হলে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা, মুষ্টিমেয় বড়লোকদের কাণ্ডকারখানা, ইংরেজ ধনপতিদের প্রভুত্ব আর লাভের অঙ্ক মোটা করার প্রয়াস, গণ-আন্দোলনকে নষ্ট করার নানা ফন্দি—এ সমস্ত বিষয়ে কিছু বলার দরকার করে না। আমরা-যে অতি অধম, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটিতেই-যে আমরা নিপুণ, আর ইংরেজদের

শাসনগুণেই-যে একটু মানুষ হয়ে উঠছি—এ কথা বললেই রিপোর্ট সার্থক হয়।

ধরা যাক যে, সাইমন কমিশনকে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল, তাহলে তারা নিশ্চয়ই সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে একটা সুনিপুণ ও সঠিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করতো। পক্ষপাতশূন্য রিপোর্টে সব কথাই নির্ভুল হ'ত, আর আমেরিকা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়ই পড়তাম :—

"যুক্তরাষ্ট্রকে সাধারণত এক দেশ বলা হয়, কিন্তু সেখানে নানা জাতি ও বহু ধর্মাবলম্বী বাস করে। একমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে প্রায় একশো আলাদা জাতের লোক থাকে। সেখানে ইতালিয়ান এত বেশি আছে যে, ইতালিয়ান শহর হিসাবে নিউইয়র্ক পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। তেমনই অত বেশি ইহুদী বা অত বেশি কাফ্রী অন্য কোনও ইহুদী বা কাফ্রী শহরে বাস করে না। নানা ধরণের লোক কাছাকাছি থাকে ব'লে প্রায়ই খুব সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামা আর খুন খারাপী লেগেই থাকে। আদিম অধিবাসীরা ছাড়া উটাতে আছে মরমণরা, মিনেসোটায় থাকে ফিনরা, মিসিসিপি নদীর ধারে ধারে মেক্সিকানরা বসতি করেছে, আর পশ্চিম উপকূলে বহু জাপানী এসে রয়েছে। বাইরের কোনো এক নিরপেক্ষ শক্তির উচিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র শাসনের ভার নেওয়া।"

এর মধ্যে প্রত্যেকটি তথ্যই নির্ভুল। কিন্তু আমেরিকার বিদেশী শাসন বরদাস্ত নয়। সাইমন কমিশনের ভারত-বিবরণার প্রত্যেক তথ্য নির্ভুল নয়। কিন্তু বিদেশী শাসনের সমর্থন হিসাবে সে বৃত্তান্ত সবাই মেনে নেবার জন্য উৎসুক।

চার্চিল সাহেব তাঁর এক চমকপ্রদ বক্তৃতায় বলেছিলেন, ইংরেজ যদি কখনও ভারতবর্ষ ছেড়ে যায় তো সেখানে শুধু রক্তপাত আর ধ্বংসলীলা চলবে। আজ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে ইংরেজ, ওলন্দাজ, জার্মান, ফরাসী,

সুইডিশ, আইরিশ ইত্যাদির বংশধরেরা বাস করছে, তাদের সম্বন্ধে আগে বলা হ'ত যে, তাদের মধ্যে বৈষম্য বড় বেশি, তেলে-জলে কখনও মিশ খেয়ে থাকতে পারে না। তখন যারা স্বাধীন আমেরিকার আসন্ন পতন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সংকোচ করেনি, তাদেরই উত্তরাধীকারীরা ভারতের অনৈক্য বিষয়ে বক্তৃতা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

ভিনসেণ্ট্ স্মিথের মতো সাম্রাজ্যগর্বী ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বদাই একটা ঐক্যসূত্রের দর্শন পাওয়া যায়। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। এদেশের সযত্নলালিত বিরোধ সত্ত্বেও গত বিশ বৎসরে যে গণ-আন্দোলন দেখা দিয়েছে, সে আন্দোলন হচ্ছে ভবিষ্যতের পূর্ণতর ঐক্যের পূর্বাভাস।

অতীতের বোঝা-যে আমাদের লঘু, তা একেবারেই নয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, আমাদের অযোগ্যতার প্রমাণ হিসাবে যে বোঝার কথা বারবার শোনানো হয়, সে বোঝাকে আরও ভারি করছে এখনকার শাসনব্যবস্থা। দেশের লোকে দেশের ভার না নিলে সে বোঝার চাপ দূর হবে না।

হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ লেগে থাকলে বিদেশী শাসকদেরই সুবিধা। কিন্তু ভারতবর্ষ যেমন হিন্দুর দেশ, তেমনই মুসলমানেরও দেশ। পাকিস্থানের সমর্থন করতে গিয়ে একজন মুসলমান নেতা সম্প্রতি বলেছিলেন যে, এদেশ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানেরই বেশি, হিন্দু মরলে তার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আর মুসলমান জীবনে মরণে এদেশকেই আঁকড়ে থাকে, মরবার পরও তার দরকার এদেশের মাটি। পাকিস্থান হোক বা না হোক, এ দেশের দৌলত' বাইরের লোক যখন নিয়ে যাচ্ছে, তখন হিন্দু-মুসলমানের একজোট হযে এর প্রতীকারের চেষ্টা না করলে চলে না। সেই একজোট হওয়ার চেষ্টা সরকার বাহাদুরের মনোমত যখন নয়, তখন একজোট উঠা একটু দুরূহ বই কি ?

জাতের বিড়ম্বনায় এদেশ বিড়ম্বিত তো বটেই, কিন্তু অস্পৃশ্য বা অনুন্নত জাতির লোকসংখ্যা যে কত, তার হিসাবও বড় তাজ্জব। দেশের লোক যখন তেমন জাগেনি, তখন সাধারণত বলা হ'ত যে, তাদের সংখ্যা হচ্ছে তিন কোটী। স্বদেশী আন্দোলনের পর ভ্যালেণ্টাইন চিরল্ বললেন, পাঁচ কোটী। ১৯২৯ সালে শ্রীমতী আনুষ্টে তাঁর প্রামাণ্য বই-এ লিখলেন, ছয় কোটী। দু'বছর পরে সার জন কামিং কয়েকজন সিভিলিয়ানের লেখা কতগুলো প্রবন্ধ সম্পাদন করলেন; তাতে বলা হ'ল, তিন থেকে ছয় কোটী। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে দেখা গেল, ৪ কোটী ৩০ লক্ষ। কিন্তু ঐ রিপোর্টেই বলা হ'ল যে, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ আর বিহার-উড়িষ্যাতে অস্পৃশ্যতা প্রথার প্রচলন কম। আর ঐ তিন প্রদেশেই অস্পৃশ্যের সংখ্যা দেখানো হ'ল ২ কোটী ৮০ লক্ষ। এরকম বিচিত্র তথ্যের মূল্য খুব বেশি নয়।

অবশ্য অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের একটা নিদারুণ অভিশাপ। কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টায় সরকার সাহায্য কখনও করেনি। অস্পৃশ্যদের আলাদা নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার জন্য শুধু সরকার খুবই খেটেছে। এগারো বৎসর আগে নিখিল ভারত অনুন্নত জাতি সম্মেলনে সভাপতি ডক্টর আম্বেদকার ঠিকই বলেছিলেন, "আমাদের দুর্গতি নিয়ে ইংরেজ প্রচার করছে বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য আমাদের উন্নতি সাধন নয়, ভারতের রাষ্ট্রিক অগ্রগতি রোধ করাই তার উদ্দেশ্য।" "আমাদের অভাব-অভিযোগ দূর করতে হলে চাই আত্মশক্তি, নিজের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করা চাই। স্বরাজ না হলে তা সম্ভব হবে না।"

বক্তৃতা আর প্রচার চালিয়ে জাতের বিড়ম্বনা দূর করা যাবে না। আধুনিক শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা আর গণতান্ত্রিক শাসনের পত্তন হ'লেই জাতের শিকল বিকল হয়ে যাবে। ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্ক্স্ লিখেছিলেন:—"ভারতের প্রগতি ও শক্তির পথে প্রধান বাধা হচ্ছে জাতি-

ভেদ প্রথা। আধুনিক শিল্পব্যবস্থায় যে বংশগত শ্রমবিভাগ জাতিভেদের ভিত্তি, তা অপসৃত হবে।" আর ১৯২১ সালে সেন্সস্ রিপোর্টে মার্ক্সের কথারই সমর্থন পাওয়া যায়:—"জামসেদপুরের মতো জায়গায় জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলে কারখানাতে পাশাপাশি কাজ করছে। অন্যের জাতি বা ধর্ম নিয়ে কারও দুশ্চিন্তা নেই।"

এদেশে যে বহু ভাষা চলিত আছে, তা আমাদের শাসকরা প্রায়ই মনে করিয়ে দেন। ভাষার সংখ্যাও দরকার মাফিক বাড়ানো হয়েছে। ১৯০১ সালের সেন্সস্ বলে যে ভারতবর্ষে ১৪৭টা ভাষা প্রচলিত ছিল। বিশ বছর পরে ভাষার সংখ্যা বেড়ে হ'ল ২২২! কোনো নূতন ভাষাভাষী অঞ্চল ইতিমধ্যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবু-যে কী ক'রে এ বৃদ্ধি ঘটলো, তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এক পুরুষে এতগুলো ভাষা "উৎপাদন" করার ক্ষমতা তাজ্জবই বটে!

আসলে ২২২টা বিভিন্ন ভাষা এদেশে চলে বলা হচ্ছে শুধু একটা রূপকথা।

একটু খোঁজ করলেই দেখা যায় যে, ২২২-এর মধ্যে ১৩৭টি হচ্ছে 'তিব্বতী-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর'। তার মধ্যে ১০৫টার এক তালিকা "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়রে" দেখা যায়। তালিকাটির কয়েকটি অংশ খুবই প্রণিধানযোগ্য:—

ভাষার নাম	ভাষা-ভাষীর সংখ্যা
কাবুই	৪
আন্দ্রো	১
কাসুই	১১
স্রাণু	১৫
আকা	২৬

ভাষার নাম	ভাষা-ভাষীর সংখ্যা
তেরুং	১২
নোরা	২

ভাষাতাত্ত্বিকরা চিরকাল ব'লে এসেছেন যে, অন্তত দুটো মানুষের মধ্যে কথাবার্তা না চললে ভাষা সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু আন্দ্রোভাষা বলেন মাত্র একজন মহারথী ; নোরা সে তুলনায় খুবই জনপ্রিয় !

সাম্রাজ্যতন্ত্রেব প্রোপাগাণ্ডা কৌশল ধরা পড়ে যায় যখন আমরা ঐ ২২২ ভাষার খোঁজ নিতে যাই। এর মধ্যে ১৪৫টী ভাষা আছে যা কোনো ভারতীয় ব্যবহার করে না। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে আর ব্রহ্মদেশ ও চীনের সীমান্তে এদের প্রচলন। এদের অধিকাংশকে ভাষা বলা চলে না, তারা বড় জোর উপভাষা মাত্র। এই দলের মধ্যে একমাত্র ভাষা হচ্ছে ব্রহ্মদেশের ভাষা।

১৯৩১ সালেব সেন্সসে ভাষার সংখ্যা ক'মে ২০২-এ দাঁড়িয়েছে। নেহাৎ অবিবেচক কয়েকজন ইতিমধ্যে মাবা যাওযার ফলেই বোধহয় এ অবনতি ঘটেছে।

১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এ ভাষা-সমাবেশে যেন মড়ক লেগে গেছে। ভাবতীয়দের অনৈক্য প্রমাণ করার জন্য যে ভাষাবৈচিত্র্যের কথা প্রচার হ'ত তার অধিকাংশ (১২৮) হচ্ছে কেবল ব্রহ্মদেশের। কিন্তু সাম্রাজ্যতন্ত্রের যেই দরকার পড়ল যে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে, অমনি অম্লানমুখে প্রচার আরম্ভ হল যে, ব্রহ্মদেশে ভাষার ঐক্য খুবই স্পষ্ট, বাকী ১২৭টী "ভাষাকে" যেন বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রভুদের মহিমা সত্যই অপার !

ব্যবসার সুবাদে এদেশের দৌলত লুটে নেবার সময় ভাষাবাহুল্যের কথা বিদেশী বণিক নির্বিবাদে ভুলে যায়। বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকায় বাণিজ্য

বিষয়ক ক্রোড়পত্রে (১৯৩৯) যারা ভারতবর্ষে মাল রপ্তানী করে, তাদের পরামর্শ দিতে গিয়ে লেখক বলেছিলেন যে, অনেক ভাষা সেখানে চলে মনে ক'রে ভড়্‌কাবার কারণ নেই, দরকারী হচ্ছে কয়েকটা ভাষা মাত্র। উত্তর ও মধ্যভারতে যে প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে, তা সেন্সাস্‌ রিপোর্ট স্বীকার না ক'রে পারেনি।

পার্লামেণ্টের বিতর্কে বা প্রবন্ধের যুক্তিতে ভারতের ঐক্য প্রমাণ বা অপ্রমাণ হবে না। গত বিশ বৎসর ধ'রে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে সে ঐক্যের সন্ধান মিলেছে। বাঁধন যতই শক্ত হোক, তা টুটবেই; এবিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

কেমন ক'রে টুটবে, তার আলোচনা এখানে দরকার নেই। সোভিয়েট দেশে পৃথিবীর "সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞ" স্বচক্ষে দেখে এসে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার "এনর্মাস ডিফিকাল্‌টিজ্‌" অতিক্রমণের যে বৃত্তান্ত তাঁর স্বদেশ-বাসীকে শুনিয়েছিলেন, সে বৃত্তান্ত আমাদের ভরসা দেবে, অনুপ্রেরণা দেবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন :—

"শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে—এখানে তাই হোলো : দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে—পদাতিকের অধম যারা ছিল, তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।"

অদূর ভবিষ্যতে কি আমাদের এই দেশ সম্বন্ধেও এমনই কথা বলা চলবে না?

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন

সকল দেশেই মালিকরা যে-কোনো উপায়ে নিজেদের মুনাফা বাড়াবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে। মজুরদের চালচুলো নেই ; মালিকদের মর্জির উপর তাদের ভরসা ক'রে থাকতে হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সামান্য পেটের ভাত আর কোমরের কাপড়টা রোজগারের চেষ্টা করতে হয়। মজুরদের সম্পত্তির মধ্যে আছে শুধু নিজেদের শ্রম। হাড়ভাঙা খাটুনি মালিকের কাছে বেচে তাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে হয়। মালিকরা সাধারণত চেষ্টা করে যথাসম্ভব কম দামে মজুরি কিনতে ; তারা জানে যে, যা-হোক্ ক'রে জীবনধারণ করতে হবে ব'লে মজুররা যা পায় তাই নিয়ে কাজ করতে একরকম বাধ্য। গরীবদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে সকল দেশের মালিকরা সব সময়ই মজুরি কমাবার আর খাটুনির সময় বাড়াবার চেষ্টা করেছে। আমাদের দেশেও এ নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি।

একলা কোনো মজুর মালিকের সঙ্গে লড়তে পারে না ; একলা পড়লে সে একেবারে অসহায়, লড়বার হাতিয়ার সে কোথায় পাবে ? তাই মালিকরা চায় যে মজুররা যেন একজোট না হতে পারে। কিন্তু মালিকদের মর্জির কাছে নিজেদের অসহায় ভাবে ছেড়ে দিতে মজুর-চাষী আর রাজী নয় ব'লেই 'ইউনিয়ন' প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। যাদের টাকা আছে আর যাদের টাকা নেই, তাদের মধ্যে যে-লড়াই কোনো না-কোনো ভাবে সব সময়েই চলছে, সেই লড়াইয়ে গরীবের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ইউনিয়ন। সংগঠন ভালো না হলে, আঞ্জুমানের ভিৎ পাকা না হলে গরীবের সমূহ বিপদ।

আমাদের দেশে মজুর-আন্দোলন খুব বেশি দিনের কথা নয়। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছিল ১৯২০ সালে—মাত্র বাইশ বছর আগে। কিন্তু অল্প দিনের হলেও এদেশের শ্রমিক-আন্দোলন একেবারেই অবহেলার বস্তু নয়। ধর্মঘটের সময় গরীব মজুরদের অটুট একতা বহুবার এদেশের ভদ্রলোকদেরও মুগ্ধ করেছে। আর মজুররা শুধু মালিকদের কাছ থেকে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করার চেষ্টাতেই ক্ষান্ত থাকে না: সমাজব্যবস্থার চেহারা না বদলালে তাদের অভাব-অভিযোগ যে মিটতে পারে না, তা ভদ্রলোকের চেয়ে তারা অনেক বেশি বোঝে। তাই দেশের রাজনীতি থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে রাখে না: দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সবার আগে যোগ দিতে চায়। অনেকেই জানেন না যে, এদেশের মজুরশ্রেণীই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানায়; ১৯২৭ সালে কাণপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে দেশের পূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি মজুর-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব'লে প্রচারিত হয়।

* * * *

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, এদেশের গরীবরা একজোট হয়ে কাজ করতে পারে না, করতে জানে না। অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য ক'রে যাওয়াই নাকি তাদের স্বভাব; বার কয়েক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা আর ভগবানের নাম ক'রে সান্ত্বনা পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া নাকি তাদের কোনো উপায় আছে ব'লে তারা মনে করে না। এ কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। চাষীদের মধ্যে সংগঠন যখন খুবই দুরূহ ছিল, তখন পশ্চিম বাংলার সাঁওতালরা ১৮৫৫ সালে নিষ্ঠুর মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, অর্থবানের রক্ষাকর্তা পুলিশ আর মিলিটারীকে পরাভূত করেছিল। নিদারুণ অত্যাচারের ফলে তারা শেষে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু একত্র হওয়ার যে দৃষ্টান্ত তারা

দেখিয়েছিল, তার দাম খুবই বেশি। ১৮৫৯-৬০ সালে নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলার চাষীরা যে লড়াই করেছিল, তারও তুলনা খুব কম মেলে। বড়লাট ক্যানিং বিলাতে লিখেছিলেন যে, এ ব্যাপার নিয়ে কিছুকাল বাংলাদেশের অবস্থা সিপাহীবিদ্রোহের সময় দিল্লীতে যেমন হয়েছিল, তেমনই হচ্ছে ব'লে তাঁর দারুণ দুশ্চিন্তা হয়েছিল। বাংলার তখনকার ছোটলাট গ্রাণ্ট্ লিখে গেছেন যে নদীয়া, যশোহর আর পাবনার মধ্য দিয়ে শফর করার সময় তিনি দেখেছিলেন, ৩০।৪০ মাইল ধ'রে নদীর দু'ধারে হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ জড় হয়ে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুবিধার দাবী করছিল। গ্রাণ্ট্ সাহেব লিখেছেন যে এতবড় জমায়েতের পিছনে নিশ্চয়ই খুব মজবুৎ সংগঠন ছিল, আর তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিল যে তারা সরকারের কাছে সুবিচার না পেলে নিজেদের জোরে আদায় ক'রে নেবে।

ধনিক-প্রথার শিল্পব্যবস্থা এদেশে আরম্ভ হবার পর থেকে কারখানাগুলি হয়েছে মজুর-সংস্থার ঘাঁটি। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বিলাতে যেমন হয়েছিল, তেমনই এদেশে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের মজুররা কারখানা জ্বালিয়ে, যন্ত্রপাতি নষ্ট ক'রে দিয়ে কিম্বা কোনো কৌশলে কারখানা অচল ক'রে দিয়ে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করে। যে কলকারখানায় তাদের যৎসামান্য মজুরির বদলে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হ'ত, সেই কলকারখানাকেই তারা শত্রু মনে করল, যন্ত্রপাতির উপরই তাদের আক্রোশ গিয়ে পড়ল। পরে তারা বুঝল যে তাদের শত্রু কলকারখানা নয়, শত্রু হচ্ছে মালিকশ্রেণীই।

শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে এত পরিষ্কার ধারণা বদ্ধমূল হতে অবশ্য অনেক বিলম্ব ঘটেছিল। প্রথম যাঁরা মজুরদের অবস্থা উন্নত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব স্বীকার করতেন না। মালিক মালিক থাকবে, মজুর মজুরী করে যাবে। ধনী-দরিদ্রে ভেদাভেদ হচ্ছে সনাতন, চিরকাল আছে, চিরকাল চলবে—তাঁদের কাছে এ কথা ছিল স্বতঃসিদ্ধ, এর আর কোনো নতুন

প্রমাণের দরকার ছিল না। শুধু পরোপকার প্রবৃত্তির দরুণই তাঁরা মজুরের দুঃখকষ্ট লাঘব করার চেষ্টায় লেগেছিলেন, শ্রমিক সংগঠনের পূর্ণ তাৎপর্য তাঁরা বোঝেননি, সমাজব্যবস্থায় বিপ্লব আনা-যে শ্রমিকদের প্রধান কর্তব্য তা মনে করার কোনো কারণ খুঁজে পাননি।

মজুর-আন্দোলন যখন থেকে বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করার উপক্রম করেছে তখন থেকেই ধনিকশ্রেণী সন্ত্রস্ত হয়ে চেষ্টা করেছে যাতে তাদের একদল তাঁবেদার মজুরনেতা সেজে বিপ্লবী মজুর-আন্দোলনকে ভুল পথে চালিয়ে ধনিকদের মতলব হাঁসিল করে। এই জাতীয় "লেবর লীডরের" সংখ্যা এখনও নগণ্য নয়। এঁরা হচ্ছেন সত্যই পুঁজিদারদের অনুচর—"labour lieutenants of the capitalist class."

*   *   *   *

১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর থেকেই ভারতীয় শ্রমিক-আন্দোলনের যথার্থ ধারাবাহিক ইতিহাস আরম্ভ হয়। কিন্তু তার আগেও আন্দোলনের যথেষ্ট সূচনা দেখা দিয়েছে।

বোধহয় প্রথম মজুর ধর্মঘট হয় ১৮৭৭ সালে, নাগপুর এম্‌প্রেস্‌ মিল্‌স্‌-এ। ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সালের ভিতর বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে পঁচিশটী ধর্মঘটের খবর পাওয়া যায়। কিন্তু আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হচ্ছে ১৮৮৪ সাল। ঐ বৎসর লোকাণ্ডে নামে এক ভদ্রলোক বোম্বাইয়ের কাপড়কলের মজুরদের এক বিরাট সভা ডেকে তাদের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও সপ্তাহে একদিন ছুটী, নিয়মিত মজুরী ও দুর্ঘটনার বাবদ খেসারত সম্বন্ধে দাবী পেশ করেন। লোকাণ্ডে "দীনবন্ধু" নামে এক পত্রিকা পরিচালনা করেন ও নিজেকে "বোম্বাই মিলমজুর সমিতির" সভাপতি ব'লে প্রচার করেন। এই সময় বোম্বাইয়ের মজুরদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। মেয়ে মজুররা এগিয়ে এসে সভায় বক্তৃতা দিতে থাকে।

সপ্তাহে একদিন ছুটীর দাবী মালিকরা মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু লোকাণ্ডে মহাশয়ের "সমিতি"কে সত্যই শ্রমিকসংস্থা বলা চলে না। সমিতির কোনো নিয়মকানুন ছিল না, টাকাকড়ি ছিল না, সভ্যদের তালিকা ছিল না। লোকাণ্ডে নিজে সর্বদা শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতেন, সাধ্যমত তাদের সাহায্য করতেন—কিন্তু তাঁকে এদেশে শ্রমিক-আন্দোলনের জন্মদাতা মনে করা ভুল হবে।

শ্রমিক-আন্দোলন ঠিক দেখা না দিলেও আন্দোলনের সূচনা ক্রমেই যথেষ্ট দেখা গেল। ১৮৯৫ সালে বজবজ চটকলে ছয় সপ্তাহ ধ'রে ধর্মঘট চলেছিল। পর বৎসর আহ্মদাবাদে কাপড়কলের ৮০০০ মজুর কাজ বন্ধ করে। কয়েকটী সরকারী ছাপাখানায় ব্যাপক ধর্মঘট হয়। সংগঠন না থাকলেও শ্রমিকদের শ্রেণীচৈতন্য ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল।

১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে শ্রমিক জাগরণের চিহ্ন আরও সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। এই সময় রাজনীতিক্ষেত্রে যে সংগ্রামশীল মনোভাব লক্ষিত হয়েছিল, তার প্রভাব নিশ্চয়ই শ্রমিকদের স্পর্শ করেছিল। ১৯০৭ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের এক কারখানায় ধর্মঘট হয়। বিখ্যাত শ্রমিকনেতা ধরণী গোস্বামীর "ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন" পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, এর নেতা ছিলেন সন্তোষ বসু নামে একজন বাঙালী কর্মচারী। বোম্বাইয়ের কাপড়কলে যে বিরাট ধর্মঘট এই বৎসর হয়েছিল, তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য বিভিন্ন রেললাইনে ধর্মঘট হয়। ধরণীবাবু বলেন যে সহানুভূতি-সূচক ধর্মঘট এই সর্বপ্রথম দেখা যায়। ১৯০৮ সালে লোকমান্য তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ডের প্রতিবাদ করার জন্য বোম্বাইয়ের শ্রমিকরা মিলিত হয়ে ছয় দিন কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখে। শ্রমিকরা কতদূর সচেতন হলে এরূপ রাজনৈতিক ধর্মঘট করতে পারে, তা সহজেই বোঝা যায়। এই সময় লেনিন ভারতের শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

১৯১০ সালে বোম্বাইয়ের কয়েকজন উদারচেতা ভদ্রলোকের উদ্যোগে "কামগার হিতবর্ধক সভা" নামে এক মজুরসঙ্ঘ গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারের কাছে দরখাস্ত করা এবং মালিক মজুরের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করা। যথার্থ 'ট্রেড ইউনিয়ন' তখনও দেখা দেয়নি। সরকারী ও রেল-কর্মচারীদের কয়েকটি সঙ্ঘ ছিল বটে, কিন্তু তারা ঠিক ভারতবর্ষের মজুর-আন্দোলনের সঙ্গে খাপ খায়নি। সাধারণ রেলমজুরের কাছ থেকে তারা নিজেদের দূরে রেখে "ভদ্রতা" বজায় রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুষ-বিপ্লবের ঢেউ এসে ভারতবর্ষে ঠেকেছিল। সারা দুনিয়ায় তখন যেন বিপ্লবের ছোঁয়াচ লেগেছিল। জিনিষ-পত্রের দর চড়ে গিয়েছিল দ্বিগুণ, অথচ সাধারণ লোকের রোজগার বাড়েনি; পুঁজিদারের লাভের অঙ্ক অবশ্য বেড়েই চলছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন যেন একটা বন্যা এসে পড়েছিল; কংগ্রেস আর মুস্‌লিম লীগের মধ্যে ১৯১৭ সালে একটা চুক্তি হয়েছিল; ১৯১৮ সালে অমৃতসরে ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের যে নৃশংস মূর্তি দেখা দিয়েছিল, তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য দেশ তৈরী হচ্ছিল।

১৯১৮ সালের শেষভাগে বোম্বাইয়ে যে বিরাট ধর্মঘট হয়, তাতে ১৯১৯-এর প্রথম দিকে যোগ দিয়েছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমিক। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে বারবার হরতালে শ্রমিকশ্রেণী সোৎসাহে যোগ দিচ্ছিল। ১৯১৯-২০ সালে প্রায় প্রত্যেক শিল্পকেন্দ্রে হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেছিল। কাণপুরে পশমকলে, জামালপুরে রেলকারখানায়, কলিকাতার পাটকলে, বোম্বাই, আহ্‌মদাবাদ, মাদ্রাজ ও শোলাপুরে কাপড়ের কলে, বোম্বাইয়ের ডকে, জামশেদপুরে লোহার কারখানায়—এই রকম নানা জায়গায় গোলমাল সুরু হয়। ১৯২০ সালের প্রথম ছয় মাসে ২০০টী ধর্মঘট হয়েছিল। প্রায় ৫ লক্ষ মজুর এই ধর্মঘটে ব্যাপৃত ছিল।

ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করার এই ছিল মাহেন্দ্রক্ষণ। কিন্তু এই সময় কোনো

সাম্যবাদী আন্দোলন এদেশে ছিল না, মজুরদের যথার্থ স্বার্থ কোথায় তা বুঝিয়ে দেবার জন্য কোনো সংগঠন ছিল না। তাই শ্রমিক-আন্দোলনে "পাঁচমিশেলি" ধরণের লোক এসে নেতা হয়ে বসতে পেরেছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন পরোপচিকীর্ষু, শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘব করতে তাঁরা চাইতেন ; অনেকে চেয়েছিলেন শ্রমিকদের কাঁধে চেপে বাজারে নাম কিনতে ; কেউ কেউ কেবল দেশের রাষ্ট্রিক সংগ্রামকে সফল করতে হলে শ্রমিকদের সাহায্য অপরিহার্য ভেবে তাদেব সংগঠনের মধ্যে ঢুকেছিলেন ; অধিকাংশেরই শ্রমিকদের যথার্থ দাবী বুঝাবার ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না। শ্রমিক-নেতৃত্বে যে গলদ তখন এসে ঢুকেছিল, তার জের এখনও চলেছে ব'লে আন্দোলন আশানুরূপ বলিষ্ঠ হয়নি।

প্রথম পাকাপাকি ইউনিয়ন হিসাবে সাধারণত নাম করা হয় মাদ্রাজ লেবর ইউনিয়নের। এব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীমতী অ্যানা বেসান্টের সহযোগী মিষ্টার বি, পি, ওয়াদিয়া। ইনি যথেষ্ট রাজভক্ত ছিলেন, ধর্মঘটেরও অনুরাগী ছিলেন না। কিন্তু নিয়মিত সভ্য ও চাঁদা সংগ্রহ ক'রে ইউনিয়ন গড়ছিলেন ব'লে মাদ্রাজের কাপড় কলওয়ালা বিনি-কোম্পানীর বিশেষ বিরাগভাজন হন। আদালতের আশ্রয় নিয়ে এই কোম্পানী আইনের কচ্‌কচির জোরে ইউনিয়নের উপর দারুণ মোটা জরিমানা চাপায় ; সে জরিমানা দেবার সামর্থ্য ইউনিয়নেব থাকা সম্ভব ছিল না। কোম্পানী মাত্র এক সর্তে ঐ জরিমানা আদায় না করতে রাজী হয়ঃ ওয়াদিয়াকে একেবারে ইউনিয়নের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছাড়তেই হবে। এইভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন প্রধান পুরোধাকে জোর ক'রে শ্রমিকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

মজুরদের ক্রমবর্ধমান শক্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য মালিকরা অন্য অনেক কৌশলও ব্যবহার করছিল। মজুর-মালিক মৈত্রীর নামে গান্ধীজীও

এই সময় কার্যত শ্রমিক-আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। আহমদাবাদের মিল-মালিকের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা অটুট ছিল ; সেখানকার শ্রমিকসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। তাই সেখানে তিনি যে শ্রমিক-সমিতি স্থাপন করেন, তার প্রধান কার্যক্রম হ'ল মজুর-মালিক বিসংবাদ বিনা ধর্মঘটে নিষ্পত্তি করা। মালিকের সঙ্গে মজুরের সংঘর্ষ-যে অবশ্যম্ভাবী, আর ধর্মঘটই-যে মজুরের ব্রহ্মাস্ত্র, তা তিনি অস্বীকার করেন। গান্ধীজীর সর্বব্যাপ্ত প্রভাবের জোরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমিতি মালিকদের সঙ্গে প্রায়ই বোঝাপড়া করতে পেরেছিল। তাই ব্রেল্‌স্‌ফর্ডের মতো বিলাতের শ্রমিক দলের প্রতিনিধি এই সমিতিকে আদর্শ শ্রমিকসংস্থা ব'লে বর্ণনা করেন। কিন্তু গান্ধীজী স্বেচ্ছায় এই সমিতিকে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিলেন, গুজরাতী শ্রমিককে সাম্যবাদের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন।

* * * *

১৯২০ সালের ৩১শে অক্টোবর বোম্বাই সহরে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এর কিছু পূর্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন বসে, লাজপৎ রায় সেখানেও সভাপতি ছিলেন। এই কংগ্রেসেই প্রথম গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব (Non co operation) গৃহীত হয়। বোম্বাইয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন জোসেফ ব্যাপ্‌টিষ্টা; ইনিও কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। দুঃখের বিষয়, যথার্থ মজুর-আন্দোলনের সঙ্গে এঁদের তেমন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এঁরা-যে শ্রমিক-আন্দোলন সম্বন্ধে অবহিত হচ্ছিলেন, তা থেকে শ্রমিকেরা কতকটা অগ্রসর হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কী অবস্থার বিরুদ্ধে মজুরদের লড়াই করতে হয়েছে, তার বিশদ বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়। তবে এবিষয়ে দু'একটা কথা হয়তো বলা দরকার।

কলিকাতার কাছে যেসব চটকল আছে, তার মধ্যে একটা বেছে নেওয়া অন্যায় হবে না। হুগলী জুট মিল্‌স্‌কে ধরলে দেখা যায় যে, ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক অংশীদার একশো টাকার শেয়ারে প্রায় ১৪০০ টাকা লাভ পেয়েছিল। ঠিক ঐ সময় কোম্পানীর বড়কর্তারা মজুরির হার কমিয়ে মজুরদের খাটুনি বাড়িয়ে দেয়। অন্যান্য বড় চটকলেও ঐরকম ব্যাপার ঘটেছিল ও এখনও ঘটে। বোম্বাইয়ে কাপড়কলে যেসব মেয়েরা কাজ করে, তাদের সঙ্গে অনেক সময় ছোট শিশুরা থাকে। সেই শিশুদের প্রায় সকলকেই আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়—যাতে তারা তাদের বাপ-মার কাজে বাধা না দেয়। গ্রাম থেকে ছোট ছেলেদের পাকড়াও ক'রে যে ভাবে সর্দাররা মিলের মজুর জুটিয়ে আনে, তাকে একরকম ক্রীতদাস প্রথা বলা চলে। যখন কোনো স্বদেশী আন্দোলন চলে, তখন বিশেষত কাপড়-কলের মালিকরা খুবই লাভ করতে থাকে। যখন ১৯২০-২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, তখন বোম্বাইয়ের বড বড় কাপড়ের কল অংশীদারদের শতকরা ১২০ থেকে ৩৬৫ টাকা মুনাফা দিয়েছে। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় আহ্‌মদাবাদের মিলমালিকরা বেজায় লাভ করছিল, আর সেই বৎসরই সেখানকার টেক্‌স্‌টাইল ইউনিয়ন হিসাব ক'রে দেখিয়েছিল যে, মজুরদের বাসের জন্য যেসব ঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে কুকুর-বিড়ালের পক্ষেও থাকা শক্ত। ১৯২১-২২ সালে বোম্বাই সরকারের এক রিপোর্টে প্রকাশ হয় যে, মজুরদের একখানা বিশ্রী ঘর দেওয়া হয়, আর সে ঘরে থাকে ৬ থেকে ৯ জন স্ত্রীপুরুষ; মজুরদের পাড়ায় স্বাস্থ্য একেবারে খারাপ, শিশুমৃত্যুর হার বড়লোকদের পাড়া বা হাসপাতালের তুলনায় ঢের বেশি। গরীবদের যেন বেঁচে থাকারই অধিকার নেই, সংগঠন ক'রে নিজেদের অবস্থা বদ্‌লানো তো দূরের কথা!

এত বাধাসত্ত্বেও শ্রমিক-আন্দোলন ক্রমেই সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলে।

১৯২১ সালে ৩৯৬টী ধর্মঘটের মধ্যে ২৯৭টী কৃতকার্য হয়। ঐ বৎসর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়েছিল আসাম চা বাগানের চিরনির্যাতিত মজুরদের বিখ্যাত ধর্মঘট। সঙ্গে সঙ্গে আসাম-বেঙ্গল রেল-মজুরেরাও সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট করে। প্রায় আড়াই মাস এই লড়াই চলে; বাংলার কংগ্রেসনেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ ক'রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৯২২ সালে রেললাইন ও কারখানায় বিশেষ বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়। ইষ্টইণ্ডিয়া রেল-মজুররা যে ব্যাপক ধর্মঘট করে, তা এদেশের শ্রমিক-আন্দোলনে বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রায় দেড়মাস এই রেলপথ অচল থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের দোষে ধর্মঘট পণ্ড হয়ে যায়। জাম্‌শেদপুরে এই বৎসর যে ধর্মঘট হয় তার জের ১৯৪২ সাল পর্যন্ত চলেছিল। মজুরদের ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখবার জন্য মালিকরা শুধু পুলিশের সাহায্য নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে সশস্ত্র সিপাহি আমদানি করেছিল। এই সময় অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার ফলে দেশে একটা নিঝুম অবস্থা এসেছিল; চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোতীলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে প্রবেশ ক'রে বক্তৃতার দাপটে স্বাধীনতা লাভ করার ব্যর্থ আশা পোষণ করছিল। মজুর-আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেস-নেতাদের বিশেষ নেক্‌নজর ছিল না। মধ্যপন্থী শ্রমিকনেতা জোশী ও চমনলাল এবং গান্ধীজীর বন্ধু অ্যাণ্ড্রুজকে নিয়ে সি, আর, দাশ, মোতীলাল নেহরু প্রভৃতি মালিকদের সঙ্গে মজুরদের যাহোক একটা মীমাংসার চেষ্টা করেন।

১৯২৪ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ভাবপ্রবণ দেশবন্ধু এই অধিবেশনে মজুরকিষাণের স্বরাজকেই প্রকৃত স্বরাজ ব'লে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু কার্যত দেশবন্ধু মজুরশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছুই করেননি। দেশে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য কংগ্রেস-

নেতারা প্রায় সকলেই মজুর-আন্দোলনের নেতৃত্ব অধিকারের চেষ্টায় ছিলেন।

মজুরদের শ্রেণীচেতনাকে অবলুপ্ত করার জন্য "শ্রমিক"-নেতা চেষ্টা করেছেন। ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ভি, ভি, গিরি শ্রমিকদের উপদেশ দেন যে, তারা যেন নিজেদের নৈতিক চরিত্র উন্নত ক'রে শান্তিতে, সন্তুষ্টচিত্তে কালাতিপাতের চেষ্টা করে। শ্রমিকসেবায় উৎসৃষ্টপ্রাণ এন্, এম্, জোশীও বহুদিন পর্যন্ত ধর্মঘট অপছন্দ করতেন, মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে শ্রমিক স্বার্থের মূলগত পার্থক্য নেই বিশ্বাস করতেন। সুখের বিষয়, সারাজীবনের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি মত পরিবর্তন করতে দ্বিধা করেননি। তিনি অবশ্য সাম্যবাদী নন্; কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ আর নেই। এই "অপরাধে" দেশবিশ্রুত ভারত-ভৃত্যসমিতির সংশ্রব তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে। গিরি-শিবরাও-চমনলাল-জাতীয় "শ্রমিক"-নেতার সঙ্গে তাঁর প্রভেদ এইখানে।

* * * *

১৯২০ সালে মজুর-আন্দোলনে যে অগ্রগতি আরম্ভ হয়, ১৯২৫-এ বোম্বাইয়ের বিরাট তিনমাস ব্যাপী কাপড়কল ধর্মঘটকে তার চরম দৃষ্টান্ত বলা চলে। এর পর ১৯২৮-২৯ সালে আবার যেন আন্দোলনে জোয়ার আসে; সাম্যবাদী প্রচারের ফলে শ্রমিকনেতৃত্বের প্রকৃতি বদলাতে থাকে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস আটটী প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পর শ্রমিক-আন্দোলন আবার অনেকটা এগিয়ে চলে।

কাণপুরে ১৯২৭ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে, একদল চায় মালিকদের সঙ্গে লড়তে, আর একদল মালিকদের স্বার্থ বাঁচিয়ে চলতে। কিন্তু বামপন্থীরাই এ অধিবেশনে সংখ্যাধিক ছিল ব'লে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা, সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট বয়কট,

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘের সঙ্গে সংযোগ প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কংগ্রেসে ৫৭টী ইউনিয়নের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন; ঐ ৫৭টী ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা ছিল ১,৫০,৫৫৫।

১৯২৬-২৮ সালে আইন ক'রে মজুর-আন্দোলনের বিপ্লবী নেতৃত্বকে পঙ্গু ক'রে দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রমিক আত্মশক্তিতে এত ভরসা রাখতে আরম্ভ করেছিল যে, আন্দোলনকে আটকানো চলছিল না। সাম্যবাদী প্রচারকরা এজন্য কম দায়ী নয়। তাই ১৯২৪ সালে কাণপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ্, ডাঙ্গে, শওকৎ উস্‌মানী ও দাসগুপ্ত চার-বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু দমননীতি সত্ত্বেও প্রচার বন্ধ হয়নি। ১৯২৬ সালে বাংলা, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে শ্রমিক কৃষক দল গঠিত হয়। ১৯২৮-এ প্রাদেশিক দলগুলিকে একত্র ক'রে নিখিল ভারত শ্রমিক-কৃষক দলের পত্তন হয়।

১৯২৮ সাল এদেশের শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তখন ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ধর্মঘটের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল লিলুয়ার কারখানা এবং ই, আই, আর লাইনের ধর্মঘট, বোম্বাইয়ের কাপড়কলে, টাটার লোহা-কারখানায় আর বাংলায় বহু চটকলের ধর্মঘট। বোম্বাইয়ে দেড়লক্ষেরও বেশি মজুর ধর্মঘটে যোগ দেয়, সব মিলগুলিই একেবারে অচল হয়ে পড়ে, মালিকরা মজুরী ছাঁটাইয়ের যে প্রস্তাব করেছিল তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। কলকাতার শহরতলীতে নানারকম কারখানায় লক্ষাধিক মজুর ধর্মঘট করে। টাটার কারখানায় পঞ্চাশ হাজার মজুর কাজ বন্ধ করে, কারখানা অচল হয়। বাউরিয়া চটকলের ১৬০০০ মজুর সাড়ে-ছয় মাস সংগ্রাম করে; বাইরের কেউ তাদের সাহায্য করেনি, খবরের কাগজ পর্যন্ত তাদের খবর ছাপায়নি।

এ সমস্ত ধর্মঘটই বিপ্লবী নেতারা চালিয়েছিল। বোম্বাইয়ে নিজেদের সভাসমিতি যাতে শত্রুরা পণ্ড না করে, সেজন্য মজুর ভলান্টিয়ার দলবদ্ধ হয়। লিলুয়া কারখানায় শত্রুর আক্রমণ থেকে মজুরদের আত্মরক্ষার জন্য তারা নিজেদের সামরিক কায়দায় ছোট ছোট দলে ভাগ করে। ১৯২১ সালে রেল ধর্মঘটের সময় দারুণ অত্যাচার হয়েছিল। মালিকরা গুলী পর্যন্ত চালিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯২৮-এর ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঘট সফল না হওয়াতে মজুররা অবশ্যই খানিকটা নিরুৎসাহ হয়েছিল, কিন্তু যখনই অবস্থা অনুকূল হয়, তখনই ধর্মঘট করতে তাদের সংকোচ হয় না। সংগঠনের ফলে আত্মবিশ্বাসই এর কারণ।

বোম্বাইয়ে কম্যুনিস্ট পরিচালিত গিরণী কামগার ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা এই সময় পঞ্চাশ হাজারের উপরে যায়। সমগ্র এশিয়াতে এর সমকক্ষ মজুরসঙ্ঘ আর ছিল না। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জি, আই, পি, রেল-মজুরসঙ্ঘ। বাংলার চটকল মজুরসঙ্ঘের স্থান ছিল তৃতীয়। এ কয়টা ইউনিয়নই বামপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল, আর মোটের উপর সারা দেশের মজুর-আন্দোলন ক্রমেই সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এ অবস্থায় অনেক "নেতা" দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, মজুরদের মধ্যে কম্যুনিস্ট প্রভাব উচ্ছেদ করার জন্য ব্যস্ত হলেন। ১৯২৮ সালে ঝরিয়াতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে এ কথা বেশ বোঝা গেল। এই অধিবেশনে বামপন্থীদের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে দক্ষিণপন্থীরা চক্রান্ত করার ফলে জি, আই, পি, রেলের কর্মচারী কুলকারাণীকে মাত্র এক ভোটে হারিয়ে জওহরলাল নেহরু ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হলেন।

১৯২৯ সালে পৃথিবীব্যাপী অর্থ নৈতিক সংকটের ধাক্কা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছাতে আরম্ভ করল। মজুরী ছাঁটাই, কারখানার নূতন নিয়ম বাহাল ক'রে মজুরের সংখ্যা কমানো ইত্যাদি কারণে আবার অনেক ধর্মঘট সুরু হয়।

১৯২৮-এর তুলনায় এবার ধর্মঘটের সংখ্যা কম হলেও ধর্মঘটীদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। একা বাংলাদেশের চটকলগুলিতে তিন লক্ষের উপর মজুর কাজ বন্ধ করে। লাটবেলাটের বক্তৃতায় আর দেশবিদেশের খবরের কাগজে এদেশে কম্যুনিজম্‌-যে মজুরদের কি দারুণ অনিষ্ট করেছে, এই নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা এখন থেকে খুবই বেশি শোনা গেল। শিবরাওয়ের মতো কয়েকজন শ্রমিক-"নেতা" ১৯২৮ সাল থেকেই গাইতে আরম্ভ করেছিলেন যে, ধর্মঘটের আওয়াজ তুলে যারা আবহাওয়া সরগরম করছে, সেই সব "হুজনদের" মজুর-আন্দোলন থেকে দূর করতে হবে।

১৯২৯ সালে মজুর-সংহতির বিরুদ্ধে সরকারের আক্রমণ পুরোদমে আরম্ভ হ'ল। লেজিস্‌লেটিভ্‌ অ্যাসেম্ব্‌লিতে সভাপতি বিঠলভাই পেটেলের বিশেষ ভোটের জোরে 'পাব্‌লিক্‌ সেফ্‌টি বিল্‌' ১৯২৮ সালে অগ্রাহ্য হয়েছিল; কিন্তু ১৯২৯ সালে বড়লাট অর্ডিনান্স বলে ঐ আইন জারি করলেন। মজুরের অস্ত্র ধর্মঘটকে অনেকটা ভোঁতা ক'রে দেওয়ার জন্য 'ট্রেড্‌স্‌ ডিস্‌পিউট্‌স্‌' আইন পাশ হ'ল। অথচ অল্পে-তুষ্ট মজুর নেতাদের দলে রাখার জন্য তাদের কয়েকজনকে 'লেবর কমিশনে'র সভ্য করা হ'ল।

ঐ বৎসর মার্চ মাসে বিপ্লবী মজুর-আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য দেশের সকল অঞ্চলের ৩২ জন প্রধান কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই হ'ল বিশ্ববিখ্যাত মীরাট কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত। সরকারের এই আক্রমণের ফলে আন্দোলনে সাময়িক বাধা সৃষ্টি হলেও বিপ্লবী মজুর শ্রেণীর মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার সামান্য মাত্র লক্ষণও দেখা যায়নি।

মীরাট মামলায় যে বত্রিশজন অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনজন ছিলেন ইংরেজ:—বেন্‌ ব্র্যাড্‌লে, ফিলিপ্‌ স্প্র্যাট, লেষ্টার হাচিন্‌সন্‌। এইজন্য এই মামলা আন্তর্জাতিক শ্রমিক-ঐক্যের দিক থেকেও স্মরণীয়। বাকী উনত্রিশ জনের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন মহারাষ্ট্রী ও বাঙালী। আজ যাঁরা

দেশের মজুর ও কম্যুনিস্ট-আন্দোলনের নেতা, তাঁদের মধ্যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, ঘাটে, ডাংগে, পি,-সি,-জোশী, মিরাজকর, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, অধিকারী, গোপাল বসাক, শামসুল হুদা, জোগ্‌লেকর, সোহন সিং জোশ্‌ প্রভৃতি অনেকেই এই মামলায় আসামী ছিলেন। মীরাটে চার বৎসরেরও বেশি বিচারের যে প্রহসন হয়েছিল, বিলাতে লেবর পার্টি গবর্ণমেণ্ট গঠন ক'রেও যে প্রহসন বন্ধ করতে চায়নি বা সাহস পায়নি, তাই নিয়ে দুনিয়ার সর্বত্র শ্রমিকমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৩ সালে বিচারফল প্রকাশ হলে দেখা যায় যে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের শাস্তি হয়েছে যাবজ্জীবন দীপান্তর। ডাংগে, ঘাটে, জোগ্‌লেকর, নিম্বকর আর স্প্র্যাটের বারো বৎসর কারাদণ্ড; তিন বৎসরের কম দণ্ড একজনকেও দেওয়া হয়নি। হাইকোর্টে আপীল করার পর এই সমস্ত দণ্ড অবশ্য অনেকটা কম হয়ে যায়। কিন্তু এদেশে ও বিদেশে এই বিচারবিভ্রাট নিয়ে তীব্র সমালোচনা না হলে শ্রমিক-আন্দোলনকে পিষে মারার এমন একটা সুযোগ সরকার নিশ্চয়ই ছাড়তো না। সে যাই হোক, মীরাট-মামলা আমাদের শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

* * * *

১৯২৯ সালে নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে ১,৮৮,৮৩৬ জন সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। গিরণী কামগার ইউনিয়ন, জি, আই, পি, রেল ইউনিয়ন আর বাংলার চটকল মজুর ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা ও প্রভাব এ অধিবেশনে বেশী ছিল। পণ্ডিত নেহরু মজুর শ্রেণীর দৈনন্দিন সংগঠন কার্যে লিপ্ত না থাকলেও তাঁর অভিভাষণে বলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দক্ষিণপন্থীরা এতে রুষ্ট হলেন; বামপন্থীদের কোনক্রমেই শ্রমিক-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্বন্ধে হতাশ হলেন, আর শীঘ্রই

'স্থাশানল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' নামে এক প্রতিদ্বন্দ্বী মজুরসংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন। আন্দোলনে ভালো ক'রেই ভাঙন ধরাবার চেষ্টা হ'ল।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হলেন স্থভাষচন্দ্র বসু, আর সেক্রেটারী হলেন কম্যুনিস্ট দেশপাণ্ডে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা আলাদা প্রতিষ্ঠান খাড়া করলেও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থীদের মধ্যে মতানৈক্য একেবারে যায়নি; বরং মীরাট-মামলায় অনেক কম্যুনিস্ট নেতা আটক থাকায় এ বিসংবাদ বন্ধ করার চেষ্টাও সফল হতে পারেনি। তাই দেখা যায় যে, ১৯৩১ সালে কলিকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে স্থভাষ বসু ও মানবেন্দ্রনাথ রায়, এই দুই কলহবিশারদের কম্যুনিস্টবিরোধী ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অবস্থা এমনি হয়ে দাঁড়ায় যে, কম্যুনিস্টরা নিজেদের আলাদা লাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস খাড়া করে। মজুর-আন্দোলনের পক্ষে এ সময়টা নিতান্তই অমঙ্গলের ছিল।

সাম্রাজ্যতন্ত্রের নিষ্পেষণে লাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বেশিদিন টিকতে পারেনি। ১৯৩৪ সালে কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মজুরসংস্থাকেও বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। ইতিমধ্যে মজুর-আন্দোলনকে আবার ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টাও চলছিল, মজুর-আন্দোলনও নেতৃত্বের বহু বৈকল্যসত্ত্বেও অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯৩৪-এর মাঝামাঝি বোম্বাইয়ে লক্ষাধিক মজুরের এক বিরাট ধর্মঘট হয়। কলকাতায় ১৫০০০ ডকমজুর ধর্মঘট করে। এ দুই ধর্মঘটেরই নেতৃত্ব করে কম্যুনিস্টরা। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের জন্য তারা ১৯৩৫-এ যে চেষ্টা করে, তা ব্যর্থ হলেও পর বৎসর তারা কৃতকার্য হয়।

এর পর চলে দক্ষিণপন্থীদের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গে ঐক্য-স্থাপনের উদ্যোগ। ১৯৩৬ সালে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ রাখার জন্য একটা কমিটি খাড়া করা হয়। ১৯৩৮-এ স্থির হয় যে, আপাতত দুই

বৎসরের জন্য ফেডারেশন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকবে; কার্যনির্বাহক সমিতিতে দুই পক্ষের সমান সংখ্যক লোক থাকবে। যে নাগপুরে শ্রমিক আন্দোলন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়, সেই নাগপুরেই ১৯৪০ সালে আবার পুনর্মিলন ঘটে। অবশ্য গান্ধীজীর আহ্‌মদাবাদ মজুর-সঙ্ঘ কখনও সর্বভারত শ্রমিক-আন্দোলনে যোগ দেয়নি। আর ১৯৪১ সালে ভেদনীতিনিপুণ মানবেন্দ্রনাথ রায় সাম্রাজ্যতন্ত্রের তাঁবেদার হিসাবে 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব্‌ লেবর' নামে নতুন এক শ্রমিকসংস্থা খাড়া ক'রে বসেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও বলা যায় যে, এদেশের যথার্থ শ্রমিক আন্দোলনে ভাঙন ধরাবার সব অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। শ্রমিকনেতারা সবাই অবশ্য একমত নন, কিন্তু তাঁবা যদি শ্রমিকসংস্থার মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে চান্, তো শ্রমিকরাই তাঁদেব ববদাস্ত করবে না।

১৯৩৭ সালে অনেকগুলি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার ফলে যে উদ্দীপনা আসে, তার ছায়া শ্রমিক-আন্দোলনে স্পষ্ট দেখা যায়। এবৎসর সব চেয়ে বড় ধর্মঘট হয়েছিল কলকাতাব কাছে চটকলগুলিতে, প্রায় তিনলক্ষ মজুর এবার কাজ বন্ধ করে। গান্ধীজীর প্রভাব যেখানে অপ্রতিহত, সেই আহ্‌মদাবাদেও ধর্মঘটের ধূম পড়ে যায়; বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী সরকার ধর্মঘটীদের পর্যুদস্ত করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি ক'রে পাঁচ জনের বেশি লোককে একত্র মিলিতে নিষেধ করে। এবারে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করেছিল কাণপুরের মজুররা, সেখানে কংগ্রেস আর শ্রমিকদের মধ্যে যে মিতালি হয়েছিল, তা সত্যই অভূতপূর্ব।

আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী-যে কতটা অগ্রসর হয়েছে, জাতির জীবনে নিজেদের অবদান সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ আমরা পাই বোম্বাই থেকে। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের প্রধান ঘাঁটি বোম্বাই শহরে কংগ্রেসী সরকারের শ্রমিক-দলন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করার জন্য বিরাট ধর্মঘট হয়। সেদিন অহিংস কংগ্রেসী সরকার শহরের রাস্তায় গুলী চালিয়েছিল ব'লে অনেক মজুর হতাহত হয়; কংগ্রেসের একজনও বড়কর্তা এবিষয়ে একটিমাত্র কথা বলেননি।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি তখন তিলমাত্র বদ্‌লায়নি ব'লে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এদেশের শ্রমিক-আন্দোলন যোগ দিতে অস্বীকার করে। সাম্রাজ্যবাদের দমননীতিতেও সামান্যমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। তাই যুদ্ধ আর দমননীতির বিরুদ্ধে ২রা অক্টোবর, (১৯৩৯) তারিখে বোম্বাইয়ের ৯০,০০০ শ্রমিক কম্যুনিস্ট-নেতৃত্বে এক বিরাট রাজনৈতিক ধর্মঘটের অনুষ্ঠান করে। যুদ্ধরত কোনো দেশেরই মজুর-আন্দোলন এমন বিরাট একটা ব্যাপার সংঘটন করাতে পারেনি। এদেশের শ্রমিক-আন্দোলনে গলদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ আন্দোলন নিয়ে আমাদের গর্ব্বেরও যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

* * * *

শ্রমিক-আন্দোলন এখনও আশানুরূপ ব্যাপক হয়নি। ১৯৩৯-এ প্রকাশিত "ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স্ অব ইণ্ডিয়া" পুস্তকে শিবরাও হিসাব করেছেন যে, দেশে সংঘবদ্ধ শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র সাড়ে তিনলক্ষ। অথচ সংঘবদ্ধ করা যায় এমন শ্রমিকের সংখ্যা বোধহয় পঞ্চাশ লক্ষের কম নয়। অবশ্য সরকারী রিপোর্টেও স্বীকার করা হয়েছে যে, অনেক ইউনিয়ন আছে যা রেজিষ্টারী করা হয় না। আর ধর্মঘটের সময় যে-রকম উৎসাহের সঞ্চার হয়, তা দেখে মনে হয় যে, কেবল ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা থেকে আন্দোলনের শক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। মজুর-সংগঠন সংখ্যার দিক থেকে সন্তোষজনকভাবে গ'ড়ে না উঠার একটা কারণ হচ্ছে, সরকার ও পুঁজিদারদের দমনব্যবস্থা এমন কঠোর যে, নিরক্ষর, চিরদুঃখী মজুর সংকট-সময় ভিন্ন ইউনিয়নে যোগ দিতে ভয় পায়, আর যতই অল্পই হোক নিয়মিত

চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্য অধিকাংশ মজুরেরই থাকে না। তাই দেখা যায় যে, সাধারণত ঠিক ধর্মঘটের আগে সংগঠনও ভালো হয়, ধর্মঘট সফল হলে সংগঠন স্থায়ী হয়, ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ একাগ্র হয়ে কাজ করলে অনেক ধাক্কা খেয়েও গিরণী কামগার ইউনিয়নের মতো সংগঠন বেশ খাড়া হয়ে থাকে। অবশ্য নিয়মিত ভাবে ইউনিয়ন সংগঠন করার কাজে লাগলে সুফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু হয়তো এখনও আমরা আশা করতে পারি না যে, ইউনিয়নের নিয়মিত সভ্যসংখ্যা আন্দোলনের যথার্থ শক্তির অনুপাতে থাকবে।

সংগঠন মজবুৎ কবার জন্য এখনই কতকগুলো জরুরী কাজ সম্পূর্ণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে বহু কষ্টে যে-ঐক্য স্থাপিত হয়েছে, তাকে কাজের ক্ষেত্রে আরও বাস্তব ক'রে না তুললে চলবে না। আব একই শিল্পে বহু ইউনিয়নকে সমসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা এখনো ভাল-রকম হয়নি। ১৯৩৯ সালে এক সম্মেলনে স্থির হয়েছিল যে, সারা দেশের কাপড় কলের মজুরদের একটা কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন করা হবে; আহ্‌মদাবাদ ছাড়া আর সব অঞ্চলের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য আমাদের দেশটা এত বিরাট যে, সব সময় এরকম কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু অন্তত প্রত্যেক প্রদেশ কিম্বা প্রত্যেক প্রধান শিল্পকেন্দ্রে একই শিল্পের সমস্ত শ্রমিক একই ইউনিয়নে যেন থাকে, সে ব্যবস্থা খুবই দরকার। আর দৈনন্দিন কাজ প্রাদেশিক ইউনিয়নের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের একটা প্রতিনিধিমূলক নিখিল ভারত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা শ্রেয়।

কলিকাতার কাছে গঙ্গার দু'ধারে ষাট মাইল ধ'রে যে বিরাট শিল্পকেন্দ্র রয়েছে, ভারতবর্ষে তার তুলনা নেই : কিন্তু সেখানে শ্রমিক-সংগঠনের কাজ এখনও খুব সন্তোষজনক নয়। চটকল মজদুর ইউনিয়ন এখনও সত্যই সুপ্রতিষ্ঠ হয়নি ; শুধু ধর্মঘটের ধুয়ো যখন ওঠে, তখনই ইউনিয়ন জোরে চলে,

এ অবস্থা সন্তোষজনক নয়। রেল-মজুরদের সংগঠন মোটের উপর খুব মজবুৎ বলা চলে না। লোহা-কারখানার মজুরদের নিয়ে ভালো ইউনিয়ন গড়া শক্ত; কোম্পানীর মনোভাব এমন জবরদস্ত যে শ্রমিকদের দন্তস্ফুট করা দুরূহ। কিন্তু শ্রমিকরা যে দরকার হলে লড়বার জন্য তৈরী, জামসেদপুর, বার্ণপুর, হীরাপুরে তার অনেক নমুনা মিলেছে। তাদের নিয়ে সংস্থা গড়ার কাজ ভালো ক'রে চালাবার সময় এসে গেছে। কয়লা খনির মজুরদের যেন অনেকটা অবহেলাই করা হয়েছে; এ দুর্নাম দূর না করলে আন্দোলনের ক্ষতি। জাহাজীদের ইউনিয়ন যাদের কবলে গেছে, তারা ঠিক শ্রমিকের বন্ধু নয় বললে অন্যায় হবে না। বাংলার ষ্টীমার কোম্পানীর খালাসীদের নিয়ে ইউনিয়ন গড়ার কাজ প্রায় আরম্ভ হয়নি বললে চলে। রেল, ষ্টীমার, ডক্, লোহা, কয়লা, যন্ত্রপাতি—এ সব শিল্পে যে শ্রমিকরা রয়েছে, তাদের জোরালো সংগঠন না থাকলে শ্রমিক-আন্দোলন সমাজের চেহারা বদ্‌লে দেশের যথার্থ মুক্তি আনবে কেমন ক'রে।

মজবুৎ সংগঠন আর অকপট নেতৃত্ব—এই হচ্ছে মজুর-আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী। এখানেও যে বিলাতের লেবর দলের পাণ্ডাদের মতো ধনিকদের কয়েকজন অনুচর "নেতা" সেজে শ্রমিক-আন্দোলনকে ভুল পথে টেনে নিয়ে যাবে না—এমন কোনো কারণ নেই। এদেশেও ওরকম "নেতার" অভাব নেই। কিন্তু সংগঠন যখন জোরালো হবে, মজুর যখন নিজেই তার আন্দোলনে নেতৃত্বের ভার সম্পূর্ণ নিজে নিতে পারবে, তখন আর এই আত্মসর্বস্ব "নেতারা" পালাবার পথ পাবেন না। আশা করি, সেদিনের আর বেশি দেরী নেই।

"অষ্ট্রো-মার্ক্‌সিজ্‌মে"র বিড়ম্বনা

সম্প্রতি বিখ্যাত "অষ্ট্রো-মার্ক্‌সিস্ট্‌" নেতা অটো বাউয়েরের মৃত্যু হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে পশ্চিম ইউরোপে যাঁরা চিন্তাশীল ও কর্মঠ সমাজতন্ত্রী নেতা বলে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে এখন শুধু কাউট্‌স্কি জীবিত রইলেন। *

কাউট্‌স্কি, বাউয়ের, হিলফারডিং প্রভৃতির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ; এককালে কাউট্‌স্কি মার্ক্‌সবেত্তাদের শিরোমণি ছিলেন, মহাযুদ্ধের বৈপ্লবিক সংঘাত তাঁকে বিপথগামী করায় সাম্যবাদী আন্দোলনেরই ক্ষতি হয়েছিল। বাউয়ের জীবনের শেষ পর্যন্ত গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন; ফ্যাশিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে তাঁর লেখা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। কিন্তু এঁদের পাণ্ডিত্যের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা থাক্‌লেও সাম্যবাদী আন্দোলনের দিক থেকে এঁদের কাজের বিচার করতে গেলে কঠোর সমালোচনাই করতে হবে। বাউয়েরের জীবন হচ্ছে সোশাল-ডেমোক্রাসির দারুণ বিড়ম্বনার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মৃতের নিন্দাবাদ অকর্তব্য; কিন্তু সমালোচনা আর নিন্দাবাদ সমার্থক নয়। আর বাউয়েরের মতো যাঁরা আজীবন আন্দোলন ক'রে গেছেন তাঁদের কাজ সম্বন্ধে মতামত স্থির না করাই অন্যায়; তাঁদের সাফল্য-অসাফল্যের আলোচনা আন্দোলনকেই সাহায্য করবে।

বাউয়ের ছিলেন দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের একজন পুরোধা; লেখক হিসাবে অতি অল্প বয়সেই তাঁর প্রসিদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের যে কঠিন পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের দুরপনেয় জাড্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

* প্রবন্ধটা লেখা হওয়ার পর কাউট্‌স্কিরও মৃত্যু হয়েছে।

লেনিনের নেতৃত্ব তখন যাঁরা মানতে রাজী হননি, তাঁদের হাতে সাম্যবাদী আন্দোলন যে দারুণ আঘাত পেয়েছিল, সে আঘাতের ফলাফলে এখনও আমাদের ভুগতে হচ্ছে। মার্ক্‌স্‌কে ঘষে-মেজে নেবার যে-চেষ্টা একশ্রেণীর জার্মান পণ্ডিত আরম্ভ করেছিলেন, তার জের এখনও মেটেনি। অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী নেতার মতো বাউয়ের উগ্র-জাতীয়তার কাছে হার মেনেছিলেন। তিনি মহাযুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যোগ দেন এবং সরকারী সম্মান লাভ করেন।

যুদ্ধের সময় রুষ ফৌজের হাতে বাউয়ের বন্দী হন। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রুষদেশে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল, আর নভেম্বরে যে বলশেভিক বিপ্লব হয়েছিল, তিনি সে দুই বিপ্লবেরই দর্শক ছিলেন। দ্বিতীয় ইণ্টার-ন্যাশনালের মতো বলশেভিক বিপ্লবের গরিমা সম্বন্ধে তিনি অন্ধ ছিলেন না, চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে থাকার দরুণ সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় যে নিদারুণ কঠোরতার প্রয়োজন হয়েছিল তাও তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু তবুও তিনি স্থির করলেন যে, প্রলেটেরিয়ট শ্রেণীর একাধিপত্যের ফলে সাম্যবাদী গণ-শাসনের প্রবর্তন না হয়ে ব্যুরোক্রেসির প্রাদুর্ভাব হবে। এরূপ ধারণার ফলেই সাম্যবাদী পণ্ডিত হলেও বৈপ্লবিক সংকটের সময় বাউয়ের প্রভৃতি সাম্যবাদী আন্দোলনকে ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ করে এসেছিলেন।

মহাযুদ্ধের পর সমস্ত ইয়োরোপে বিপ্লবের আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১৯ সালে লয়েড জর্জ, উড্রো উইলসন, হার্বার্ট হুভার প্রভৃতি লেখায় ও বক্তৃতায় 'ইয়োরোপ বলশেভিক হয়ে যাচ্ছে' এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বলশেভিক বিপ্লব যাতে রুষদেশ থেকে কোথাও না ছড়াতে পারে, রুষদেশেও যাতে বলশেভিক শাসনের পতন হয় সেজন্য পূর্ব ইয়োরোপের "স্বাস্থ্যরক্ষার" জন্য নূতন রাষ্ট্র স্থাপন ক'রে একরকম "দড়ী" ("Cordon sanitaire") বেঁধে দেওয়া হয়। আর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে একযোগে নানা দিক থেকে আক্রমণ করে, বিদ্রোহী

বলশেভিক-বিরোধীদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। মধ্য আর পূর্ব ইয়োরোপে বিপ্লবকে রোধ করার জন্য দু'বছরের মধ্যে প্রায় ১৪ কোটি পাউণ্ড ধার দেওয়া হয়, যুদ্ধের পর যে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে সেখানে বলশেভিক বিপ্লব আগতপ্রায় হয়েছিল, তাকে সরাবার ব্যবস্থা হয়। ধনতন্ত্রের পক্ষে এর চেয়ে লাভে টাকা খাটানো ইতিহাসে কখনও হয়নি বলা চলে। তবুও হাঙ্গেরীতে কয়েক মাস বলশেভিক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ব্যাভেরিয়াতে সোভিয়েট শাসন স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত মধ্য, পূর্ব ও পশ্চিম ইয়োরোপের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর বিপ্লবের আশঙ্কা দূর হয়নি। বিপ্লবকে সুদূরপরাহত করতে সাহায্য করেছিলেন সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল। বাউয়েরের দায়িত্ব এ ব্যাপারে কম নয়। কিন্তু একলা তাঁকে দোষ দেওয়া অন্যায় হবে। ১৯১৮ থেকে ১৯২০ পযন্ত অষ্ট্রীয়ার নূতন প্রজাতন্ত্রের শাসনভার বুর্জোয়া ও সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল একজোট হয়ে গ্রহণ করেছিল। বাউয়ের হলেন পররাষ্ট্র সচিব, আর তাঁর সহকর্মী ডয়েচ্ হলেন সমর সচিব।

"The Austrian Revolution of 1918" নামে বাউয়েরের যে বই আছে, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন যে তখন অষ্ট্রীয়ান পল্টনের বিপ্লবী মনোভাব খুবই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, সৈনিকরা নিজেদের বিপ্লবের অগ্রদূত মনে ক'রে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। পথে ঘাটে সর্বত্র "সোভিয়েট শাসন চাই", "প্রলেটেরিয়ন ডিক্টেটর্‌শিপের জয় হোক্" রব শোনা যাচ্ছিল। কোনো বুর্জোয়া সরকারের পক্ষে জনগণের সে বিক্ষোভ ও উৎসাহকে রোধ করা অসম্ভব ছিল। বুর্জোয়া সরকার যদি বিপ্লব দমনের উদ্যোগ করত তাহলে সপ্তাহের মধ্যেই গণশক্তি তাকে বিধ্বস্ত ক'রে বিপ্লবী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করত।

এই অবস্থায় গণশক্তির দাবীকে বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে আনার ক্ষমতা একমাত্র সোশাল-ডেমোক্রাটদেরই ছিল। সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলকে

জনসাধারণ বিশ্বাস করত। সুতরাং ঐ দলই অষ্ট্রিয়ান সৈনিকদের শান্ত ক'রে বৈপ্লবিক ব্যগ্রতাকে দমন করতে পারত। সোশাল-ডেমোক্রাটদের বাদ দিয়ে কোনো বুর্জোয়া সরকার খাড়া করা অসম্ভব ছিল; তাই সোশাল-ডেমোক্রাটরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন ক'রে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে রাজী হয়েছিল।

এসব কথা বাউয়েরের বই থেকেই পাওয়া যায়। জার্মানীতে যেমন সোশাল-ডেমোক্রাটরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিতালি ক'রে সাম্যবাদী আন্দোলনকে বহুকালের জন্য পঙ্গু করেছিল, অষ্ট্রিয়াতেও তাই ঘটল। অবশ্য বাউয়ের ও তাঁর দলস্থ সকলে এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অষ্ট্রিয়ার মতো ছোট দেশে প্রলেটেরিয়ন বিপ্লব সম্ভব হলেও তা শীঘ্রই নিশ্চয় পরাভূত হ'ত। কিন্তু হাঙ্গেরী ও ব্যাভেরিয়ায় সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; জার্মানী ও ইতালীতে বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রায় সাফল্য লাভ করেছিল, নেতাদের অবিমৃষ্যকারিতাই তাদের অসাফল্যের প্রধান কারণ। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ব্যাভেরিয়া এই তিন দেশে সোভিয়েট শাসন স্থাপিত হলে মধ্য-ইয়োরোপ, তথা সমগ্র ইয়োরোপের ইতিহাস বদ্‌লে যেতে পারত। তার বদলে দেখি যে অষ্ট্রিয়ার সোশাল-ডেমোক্রাসি হাঙ্গেরী, ব্যাভেরিয়াকে কিছুমাত্র সাহায্য করল না। তার ফলে যখন সেখানে ক্রূর ধনতান্ত্রিকরা রক্তের বন্যায় বিপ্লবকে ডুবিয়ে দিল, তখন বাউয়ের প্রভৃতি, অষ্ট্রিয়া ঐ অনাচার থেকে রক্ষা পেয়েছে ব'লে, নিজেদের অভিনন্দন করতে আরম্ভ করলেন। এই ব'লে তাঁরা অবশ্য কিছুকাল জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিলেন; কিন্তু বুর্জোয়ারা-যে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়নি, তা পরিষ্কার বোঝা গেল ১৯৩৪ সালে; "অষ্ট্রো-মার্ক্‌সিস্ট"দের বিড়ম্বনা তখন সম্পূর্ণ হল। মহাযুদ্ধের পর শান্তিস্থাপনের প্রশংসা তাঁরা নিয়েছিলেন; কিন্তু সে শান্তি স্থায়ী হল না। অষ্ট্রিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলন পঙ্গু হয়ে গেল, অষ্ট্রিয়ার বিপ্লবী জনসাধারণের কষ্টের অন্ত রইল না। যখন

বিজয় তাদের প্রায় করায়ত্ত ছিল, তখন বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের ফল অষ্ট্রীয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের দারুণ পরাজয়। কূটবুদ্ধিতে বুর্জোয়াদের হারাণো বড় সহজ নয় ; তাই অষ্ট্রীয়ার "মার্ক্‌সিস্ট"রা বুর্জোয়া প্রভুত্বেরই পথ পরিষ্কার করে দিল, ১৯৩৪ থেকে আজ পর্যন্ত অষ্ট্রীয়ার যে অতি অপ্রীতিকর ইতিহাস চলেছে, তার দায়িত্ব বাউয়ের ও সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলকে নিতে হবে। ১৯২১ সালের "Bolshevism or Social Democracy ?" পুস্তকে সাম্যবাদী নেতা হিসাবে বাউয়েরের অকৃতিত্বেরই প্রমাণ মিলবে।

জার্মানীতে সোশাল-ডোমোক্রাসির বিড়ম্বনার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় যে, সেখানে কম্যুনিস্টরা সাম্যবাদী ঐক্যের পথে বাধা দিত, কিংকর্তব্য নির্ধারণে তাই অনেক মুস্কিল হ'ত। এ কৈফিয়তের সত্যাসত্য আলোচনায় এখন কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু অষ্ট্রিয়াতে সে রকম কোনো ওজর খাটে না। অষ্ট্রিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন সব দেশের তুলনায় ভাল ছিল। যে দেশের লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ, সেখানে ডোমোক্রাটিক দলের সভ্যসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ; এরা সকলেই চাঁদা দিত, নামমাত্র সভ্য ছিল না। ভিয়েনা শহরে ভোটারদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন, আর ভিয়েনার বাইরে শতকরা ৪০ জন ঐ দলকে সমর্থন করত। কম্যুনিস্ট দল ১৯৩৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলের নিশ্চেষ্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলে একত্র সংগ্রামের ব্যবস্থা করেছিল বটে ; কিন্তু জার্মানীর তুলনায় কম্যুনিস্ট দলের সভ্যসংখ্যা খুবই কম ছিল। সোশাল-ডোমোক্রাটিক দলের মধ্যে (অন্তত ১৯৩৪-এর পূর্ব পর্যন্ত) কোনো রকম ভাঙনের চিহ্ন দেখা যায়নি। "Tactical Lessons of the Austrian Catastrophe" (১৯৩৪) ব'লে এক পুস্তিকায় বাউয়ের নিজে স্বীকার করেছিলেন যে কম্যুনিস্টদের সংখ্যা এত কম ছিল যে, সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলের দারুণ পরাভবের দায়িত্ব একমাত্র সোশাল-ডেমোক্রাটদেরই নিতে হবে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বাউয়ের ও তাঁর সহকর্মীদের "বামপন্থী" বলেই খ্যাতি ছিল। সে জন্য তাঁদের বিশেষ করে "Austro-Marxist" বলা হ'ত। ভিয়েনার মিউনিসিপ্যালিটি অধিকার ক'রে শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁরা অনেক ব্যবস্থা করেছিলেন। ভিয়েনার "কার্ল-মার্ক্‌স্‌হফ্‌" প্রভৃতি শ্রমিক-আবাস দেখার জন্য দেশদেশান্তর থেকে লোক আসত। পৃথিবীর সকল দেশের সাম্যবাদীরা ভিয়েনার নাম করে গর্ব করত। "অষ্ট্রো-মার্ক্‌সিস্ট" নেতাদের "সততা" সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ ছিল না, এখনও সেরকম সন্দেহের কোনো কারণ নেই। কিন্তু সততা বা অকাপট্য যাই হোক্ না কেন, আমরা লেনিনের ভাষায় বলতে পারি যে, বিপ্লবী-আন্দোলনের পক্ষে "sincerometer" (অকাপট্য মাপ বার যন্ত্র)-এর কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে কর্মপদ্ধতির কার্যকারিতার আলোচনা। সেদিক থেকে দেখলে বিচারফল বাউয়ের ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধেই যাবে।

"বামপন্থী" বাউয়ের কিছুকাল হামবুর্গ থেকে এক নূতন ইন্টারন্যাশনাল ("Two & a half") চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হল। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের অটল নিশ্চেষ্টতাই জয়ী হল; বাউয়েরকে হার মান্‌তে হল।

অষ্ট্রিয়ার সোশালিস্টরা বাউয়েরের নেতৃত্বে "বামপন্থা" অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল। "Der Kampf" (সংগ্রাম) ব'লে তার কাগজ দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের মোড়ল ব্রিটিশ লেবর পার্টির চেয়ে অনেক বেশী "অগ্রসর" কর্মপদ্ধতি সমর্থন করত। কিন্তু পাণ্ডিত্য ও বামপন্থী সহানুভূতিই যথেষ্ট নয়। যে বাস্তব ভিত্তির উপর লেনিন তাঁর দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাকে অগ্রাহ্য করা সাম্যবাদীর পক্ষে আত্মঘাতী। বাউয়েরের নেতৃত্বের যখন পরীক্ষা এল, তখন তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯২৭ সালে ফ্যাশিজ্‌মের প্রসার সম্বন্ধে সরকারের ঔদাসীন্য দেখে অষ্ট্রিয়ার শ্রমিকরা যখন

বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, তখন সোশাল-ডেমোক্রাটিক নেতারা, বিশেষত ভিয়েনার বিখ্যাত মেয়র সাইত্‌স্‌ ক্রুদ্ধ জনতার মধ্যে গিয়ে তাদের শান্ত করেন। হাঙ্গামায় একশো স্ত্রীপুরুষের প্রাণ যায়; তার মধ্যে পুলিশ ছিল মাত্র পাঁচজন! গণতন্ত্র ও শান্তির নামে সোশাল-ডেমোক্রাটরা ফ্যাশিজ্‌মের রক্ষাকর্তা হিসাবেই কাজ করেছিলেন।

গণশক্তির উপর বাউয়ের প্রভৃতির সত্যই কোনো আস্থা ছিল না। পার্লামেণ্টে সভ্যসংখ্যা সম্বন্ধেই তাঁরা বেশী মনোযোগ দিতেন। তাই দেখা যায় যে, ১৯৩১ সালে উল্লসিত হয়ে অষ্ট্রিয়ার সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল রিপোর্ট দিল যে, পার্লামেণ্টে দলের সংখ্যাধিক্য হয়েছে, সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা নিয়ে শ্রমিকদের আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ("The purely political problems have ended with the complete victory of the working class"—Report to the Vienna Congress of the Second International, July, 1931.)

খর্বকায় ডলফ্যুস যখন একাধিপত্য স্থাপন করলেন, তখন জার্মানীর মতো অষ্ট্রিয়ার সোশাল-ডেমোক্রাটরা তাঁকে সমর্থন করেছিল। "The Social Democrats made every imaginable effort to avert a violent issue. Again and again we offered to agree to the granting of extraordinary powers to the Government for a period of two years, all that we asked in return being the most elementary legal freedom of action for the Party and the Trade Unions." এই হচ্ছে বাউয়েরের নিজের কথা। জার্মানীতে যেমন ব্র্যানিংকে সোশাল-ডেমোক্রাটরা সাহায্য করেছিল, এমনকি "lesser evil" হিসাবে হিটলারের সঙ্গে মিটমাটের বৃথা চেষ্টা করেছিল, অষ্ট্রিয়াতে একরকম সেই ব্যাপারেরই পুনরভিনয় হয়েছিল।

১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মরিয়া হয়ে নেতাদের নিশ্চেষ্টতা সত্ত্বেও জনসাধারণ সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তখন অতিরিক্ত বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। নেতারা তখন তাদের সমর্থন করেছিলেন, বাউয়ের নিজে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদেরই দোষে জনসাধারণের পরাজয় ঘটল। এই সময় অষ্ট্রিয়ার গণশক্তি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, সকল সাম্যবাদীর কাছে তা খুবই গৌরবের বিষয়। কিন্তু শুধু বীরত্বেই সাফল্য মেলে না, তীক্ষ্ণবুদ্ধি নেতৃত্বেরই সেখানে অভাব ছিল।

"Austrian Democracy under Fire" পুস্তিকায় বাউয়ের স্বীকার করেন যে, ১৯৩৩ সালে ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে গণশক্তির বিজয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সোশাল-ডেমোক্রাট নেতারা সে লড়াই ঘটতে দেননি। এগার মাস বাদে যে অন্তর্যুদ্ধ তাঁরা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তাই বেধে গেল, "under conditions that were considerably less favourable to ourselves. It was a mistake—the most fatal of our mistakes." ("Democracy under Fire" by Otto Bauer.)

১৯৩৪ থেকে বাউয়ের চেকোশ্লোভাকিয়াতে বাস করছিলেন; প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে; শেষ পর্যন্ত ভুল স্বীকার করলেও "অষ্ট্রো-মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌"কে তিনি ছাড়তে পারেননি। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ; গণতন্ত্র ও শান্তির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল বিপুল। কিন্তু দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের কর্ম পদ্ধতি বদলাতে তিনি পারেননি, তেমন চেষ্টাও করেছেন ব'লে জানা নেই। মার্ক্‌সবাদের কদর্থ করলে যে বিড়ম্বনা ঘটে, তাঁর জীবন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। *

* আশ্বিন ১৩৪৫-এ "মন্দিরাতে" প্রকাশিত।

মানুষ খুনের ব্যবসা

কিছুকাল আগে একজন হিসাব ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে সর্বসমেত খরচ হয়েছিল আট হাজার কোটী পাউণ্ড। ঐ টাকাটার অপব্যয় না ক'রে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খরচ করার মর্জি যদি কর্তাদের হ'ত, তাহলে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়ম আর রুষদেশের প্রত্যেক পরিবারকে পনেরো বিঘা জমির উপর সাত হাজার টাকার এক বাড়ী আর আড়াই হাজার টাকার আসবাবপত্র দেওয়া চলত! এ ছাড়া যা উদ্বৃত্ত থাকৃত, তা থেকে যে যে শহরের লোকসংখ্যা এক লক্ষের বেশী সেই রকম প্রত্যেক শহরে দেড়কোটী টাকা দিয়ে লাইব্রেরী আর তিনকোটী টাকা খরচ ক'রে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা যেত। ১৯৩৫ সালে লীগ অফ্ নেশন্সের হিসাব অনুসারে যুদ্ধ-সজ্জার জন্য পৃথিবীর নানা দেশ খরচ করেছিল মোট ৮৫ কোটী ৫৯ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড। পাঠক যদি রোজ দু'পাউণ্ড (অর্থাৎ সাতাশ টাকা) খরচ ক'রে যান, তাহলে ঐ টাকা নিঃশেষ হতে দশ লক্ষ বৎসরেরও বেশী লাগবে। ঐ টাকাকে মোহর ক'রে নিয়ে যদি কেউ প্রতি সেকেণ্ডে একটা ক'রে গুণতে থাকে, তাহলে ২৬ বৎসর ধরে তাকে গুণে যেতে হবে। এই দারুণ অপব্যয় হয়ে থাকে যুদ্ধ আর যুদ্ধের আশঙ্কার দরুণ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছে, তাদের তৈরী ঐশ্বর্যের এই হচ্ছে পরিণাম। সে ঐশ্বর্যের একটু ভাগ চাওয়া হচ্ছে তাদের পক্ষে এক অতি ভীষণ অপরাধ! সে ঐশ্বর্য যারা উপভোগ করছে, তাদের মধ্যে এক দলের কথা আমাদের বিশেষ ক'রে মনে রাখা প্রয়োজন। তারা কামান, বন্দুক, গুলি, বারুদ, বিষগ্যাস, সাবমেরিন,

ট্যাঙ্ক, যুদ্ধের এরোপ্লেন তৈরী করার কারখানার মালিক। যত বেশী মানুষ যত বেশী যন্ত্রণা পেয়ে লড়াইয়ে মরে, তাদের মুনাফার হার সেই অনুপাতেই বেড়ে থাকে। খ্রীষ্টানদের প্রার্থনায় ভগবানের কাছে রুটী চাওয়া হয়েছে, প্রথম যারা খ্রীষ্টান ছিল তারা মোটের উপর গরীব ছিল ব'লে; আজকের যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরা সে প্রার্থনাকে বদ্‌লেছেন, তাঁরা রোজই ভগবানের কাছে আর্জি পাঠাচ্ছেন যাতে পরমকারুণিক জগদীশ্বর অন্তত মাঝে মাঝে ছোটখাট একটা যুদ্ধের ব্যবস্থা করেন।

যুদ্ধের অস্ত্রসরবরাহ যাদের ব্যবসা, দেশভক্তি বা নীতিবুদ্ধি তারা জলাঞ্জলি দিয়েছে। ঐ ব্যবসায় সব চেয়ে বড় নাম হচ্ছে জার্মানীর ক্রুপ্‌। ক্রুপের কামান প্রথমে জার্মানীতে তেমন আদর পায়নি। ১৮৫৬ সালে ক্রুপের দালালরা মিশরের খেদিভের কাছে ছত্রিশটা বিক্রয় করার পর প্রাশিয়ার টনক নড়ে, আর তখন থেকে ইয়োরোপের বাজারে ক্রুপের অগাধ প্রতিপত্তি সুরু হয়। ১৮৬৬ সালে ক্রুপের কারখানা থেকে নিরপেক্ষভাবে প্রাশিয়া আর অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধের মালমশলা সরবরাহ করা হয়। ঐ বৎসর ৯ই এপ্রিল তারিখে প্রাশিয়ার সমর-সচিব ক্রুপের কাছে চিঠি লেখে যে, তাঁর অনুমতি না হলে অষ্ট্রিয়াকে মাল দেওয়া চলবে না। স্বদেশভক্ত ক্রুপ এ ব্যবস্থায় রাজী হল না, কিন্তু স্বদেশ-ভক্তির প্রমাণ হিসাবে ব্যবস্থা করল যে, ভবিষ্যতে অষ্ট্রিয়াকে কামান পাঠানোর সময় প্রাশিয়ান সরকারকে গোপনে জানানো হবে, মাঝ-রাস্তায় সেগুলো আটকাবার ভার রইল প্রাশিয়ার উপর। প্রাশিয়ার রাজভক্ত প্রজা ক্রুপের ব্যবসায়ী নীতিবুদ্ধির মান রাখা হল, দেশভক্তিও বাঁচ্‌ল, আর ক্রুপের পকেটে দু-পক্ষ থেকেই টাকা এল!

১৮৭০ সালে প্রাশিয়া আর ফ্রান্সের মধ্যে লড়াই বাধ্‌বার কিছু আগে ক্রুপ্‌ ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব গোপনে পাঠিয়েছিল। নেপোলিয়ন ক্রুপের কারখানায় কোনো

ফরমাস দেননি বটে, কিন্তু ক্রুপের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সম্মান, লিজন অফ অনারের ক্রস্ পাঠিয়েছিলেন।

১৯১৪ সালের আগে ক্রুপ মহানন্দে সকল দেশের সঙ্গে ব্যবসা চালাচ্ছিল। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল, তখন ইংরেজদের কামান দাগা হচ্ছিল জার্মান ক্রুপের মাল-মশলা নিয়ে। ক্রুপের আবিষ্কারের লাইসেন্স নিয়ে ভিকার্স আর অন্যান্য ইংরেজ কারখানা দারুণ লাভের ব্যবসা চালাচ্ছিল। যুদ্ধের সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা দেশভক্তির প্রবল বন্যায় নিজেদের লাভের চিন্তাকে ভাসিয়ে দিতে রাজী হয়নি। হল্যাণ্ড আর সুইডেন দিয়ে তারাই ক্রুপকে লোহা, তামা, নিকেল প্রভৃতি বেচ্ছিল, তা দিয়ে জার্মানীর সমরাস্ত্র তৈরী হবে ব'লে। আর জার্মান ক্রুপ্ সুইট্‌জারল্যাণ্ড দিয়ে ফ্রান্সে ইস্পাত পাঠাচ্ছিল, ফ্রান্সের যুদ্ধায়োজনকে সাহায্য করার জন্য ১৮৬১ সালে প্রাশিয়ার প্রিন্স উইলিয়ম (যিনি পরে হয়েছিলেন জার্মানার কাইজার, প্রথম উইলিয়ম) ক্রুপের এসেনস্থ কারখানায় গিয়ে ঐ ধুরন্ধরের স্বদেশ প্রেমের প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৩৬-এ হিটলার তার বন্ধু ক্রুপ ফন বোলেনের অতিথি হয়ে এসেনের কারখানা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ করেন। জার্মানীতে অদলবদল অনেক হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু নশ্বর পৃথিবীতে ক্রুপ যেন অবিনশ্বর হয়ে বিরাজ করছে। ক্রুপ্ সম্বন্ধে আরও অনেক খবর পাওয়া যাবে সম্প্রতি প্রকাশিত এক বই-এ: তার নাম হচ্ছে Blood and Steel: the Rise of the House of Krupp—by Bernhard Menns.

বাণিজ্যের বিশুদ্ধ রীতি অনুযায়ী অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা শত্রু-মিত্র ভেদ করে না। বুয়র যুদ্ধের সময় ইংরেজ কোম্পানী ভিকার্স নিরপেক্ষভাবে উভয় পক্ষকে অস্ত্রাদি সরবরাহ করেছিল। মরক্কোতে যখন আবদেল করিম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তখন তার অস্ত্রশস্ত্র আসত ফরাসী কারখানা থেকে। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজদের তৈরী 'মাইন্' ব্যবহার ক'রে ইংরেজ জাহাজকে

ডোবানো হয়েছে। দার্দানেলিসে তুর্কীরা ইংরেজ কামান নিয়ে ইংরেজ যোদ্ধাদের হারিয়েছিল। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপানের বন্ধু ইংলণ্ড নির্বিকারভাবে উভয় পক্ষকে যুদ্ধের মাল-মশলা পাঠিয়েছিল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে রকম মৈত্রী আছে, তা অন্যক্ষেত্রে অনুকরণ হলে সুখের বিষয় হ'ত। ফরাসী শ্নাইবের-ক্র্যজো, চেক্ স্কোডা, জার্মান ক্রুপ, ইংরেজ ভিকার্স আর্মষ্ট্রং—এরা সকলে যেন এক মহামহীরুহের শাখা মাত্র। যুদ্ধের গুজব রটালে তাদের মুনাফা বেড়ে চলে ; যুদ্ধ লাগিয়ে আর যুদ্ধের আশঙ্কা ছড়িয়ে বেড়াতে তাদের দালালদের জুড়ি নেই।

এক অতি বিখ্যাত দালাল ছিলেন সার ব্যাজল্ জ্যাহারফ। গ্রীককুলোদ্ভব এই অদ্ভুতকর্মা ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ উপাধি পেয়েছিলেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র গুণ ছিল অস্ত্রশস্ত্রের দালাল হিসাবে আশ্চর্য দক্ষতা। সকল দেশের সকল যুদ্ধ-ব্যবসায়ে তাঁর হাত ছিল ; মহাযুদ্ধের সময় ও পরে তাঁর প্রভাব ছিল বিশাল। হঠাৎ গ্রীক সরকারকে নূতন আবিষ্কার 'সাবমেরিণ' বেচে অন্যান্য শক্তির টনক নাড়িয়ে এর জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত নানা দেশের নানা সম্মান ভূষিত হয়ে জ্যাহারফের মৃত্যু হয় কয়েক বৎসর আগে। মানুষ মারার ব্যবস্থাকে উন্নত করাই ছিল এঁর জীবনের মহৎ ব্রত। ধনিক সমাজ এঁর মতো লোকেরই সম্মান করে।

আর এক ধুরন্ধর হচ্ছেন সার হেনরি ডেটারডিং। ইনি জাতে ওলন্দাজ হলেও ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে উপাধি পেয়েছেন। কারণ হচ্ছে এই যে, আমেরিকান ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য ইনি খাড়া করেন রয়েল ডাচ শেল ব'লে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট অধিকারস্থ তেলের খনিগুলি হস্তগত না করতে পারায় এঁর ক্ষোভের সীমা নেই। সোভিয়েট-বিরোধী চক্রান্তে আর হিটলারের সমর্থনে এঁর মতো প্রভাবশালী কর্মী আর নেই বললেও চলে।

জার্মান আর ফরাসী পুঁজিদারদের পরস্পর মৈত্রীর ফলে ঐ দুই দেশের সীমান্তে ব্রিয়ে উপত্যকায় যে লোহার খনি ছিল তার উপর মতলব ক'রে বোমা ফেলা হয়নি। জার্মান এরোপ্লেন থেকে ফরাসী খনির উপর বোমা পড়েনি; ফরাসী এরোপ্লেন থেকেও জার্মান খনির উপর বোমা পড়েনি। এই ব্যাপারের কথা বহুদিন গোপন থাকার পর ফরাসী পার্লামেণ্টে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। দুপক্ষের সেনাপতিরাও যে পুঁজিদারদের কাছ থেকে পুরস্কার পাননি, তা নয়। অথচ যেখানে বোমা ফেললে চার বছরের যুদ্ধ দু-বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত, সে যায়গাটাকে প্রায় পবিত্র মনে ক'রে বাদ দিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অর্থলোভ স্বাদেশিকতাকে যে কতদূর নিষ্প্রভ ক'রে দিতে পারে, লক্ষ লক্ষ নির্দোষীকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই অদ্ভুত ঘটনা। যাঁরা এ বিষয়ে খুঁটিনাটি খবর চান, তাঁরা Union of Democratic Control কর্তৃক প্রকাশিত Patriotism Limited নামে এক পুস্তিকা যেন পড়ে দেখেন।

অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কুকর্মের কথা নানা দেশের অনুসন্ধান সমিতির কাছে ধরা পড়েছে। কিন্তু কখনও অনুসন্ধানের যা সিদ্ধান্ত, সে অনুসারে কাজ আজও হতে পারেনি। কারণ, অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পশ্চাতে রয়েছে সমস্ত পুঁজিদারের দল, আর যে-যুদ্ধ হচ্ছে অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কাছে ভগবানের প্রসাদ, তা ধনিক সমাজের চিরন্তন সহচর। ধনিকতন্ত্রের উচ্ছেদ না হলে যুদ্ধের নিপাত নেই, লোভসর্বস্ব অস্ত্র-ব্যবসায়েরও বিলোপ হবে না। *

* "আনন্দবাজার পত্রিকার" সৌজন্যে পুনর্মুদ্রিত। ১৯৩৮ সালের লেখা।

রুষ বিপ্লব ও লেনিন

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিনের মৃত্যু হয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৭০ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চুয়ান্ন বৎসর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু জীবনের মাপকাঠি শুধু বয়স নিশ্চয়ই নয়। লেনিন বলশেভিক দলকে গড়েছিলেন; সোভিয়েট বিপ্লবের তিনি ছিলেন কর্ণধার; কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি দুনিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন, গুরু ছিলেন। যে অবদান তিনি রেখে গেছেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

কায়মনোবাক্যে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ব'লে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এক রকম চাপা পড়ে গিয়েছিল। রোজনামচা লেখার মতো অবসর বা ইচ্ছা তাঁর ছিল না, আত্মজীবনী রচনা করতে বসার মতো অহমিকাও তাঁর ছিল না। সাম্যবাদী বিপ্লব ছিল তাঁর দিবারাত্রির স্বপ্ন: কিন্তু কোনকালেই স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না ব'লে তিনি সারাজীবন কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও আমরণ সহকর্মী ক্রুপ্‌স্কায়ার লেখা "লেনিনের কথা" পড়ে দেখলে তা বোঝা যাবে। তাঁর কোনো কোনো চিঠি থেকে মনে হয় যে এজন্য হয়তো তাঁকে কয়েকটি গভীর অনুভূতিকে নির্দয়ভাবে দমন ক'রে রাখতে হ'ত। কিন্তু সে আলোচনায় নেমে লেনিনের জীবনের ভাববিলাসী ব্যাখ্যা করলে তাঁর স্মৃতির প্রতি অসম্মানই দেখানো হবে। লেনিনের জীবনে স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছিল তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয় (unity of theory and action), যা হচ্ছে মার্ক্‌স্‌বাদের একটা প্রধান অঙ্গ। তাঁর এক প্রধান গ্রন্থ "রাষ্ট্র ও বিপ্লবের" ক্রোড়পত্রে তিনি লিখেছিলেন,

"বিপ্লব সম্বন্ধে লেখার চেয়ে আসল বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী প্রয়োজন ও সুখকরণ"; এ বইটি তিনি লিখেছিলেন ১৯১৭ সালের বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে।

ইতিহাসে আর কোনো মহাপুরুষ বহুজনেব উপর নেতৃত্ব ক'রেও আত্মপ্রসাদ-লালসাকে এমন অবলীলাক্রমে অবজ্ঞা করতে পেরেছেন ব'লে জানি না। তাই তাঁর স্মৃতির সম্মান করতে হলে তাঁর মতের দৃঢ়তা, অসাধারণ কর্মক্ষমতা, সামান্য ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য সম্বন্ধে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি, বিপ্লব আন্দোলনকে যাবা বিপথে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে করে তাদের প্রতি নির্মম মনোভাব—ইত্যাদি বিপ্লবী গুণের কথা স্মরণ করতে হবে।

মানুষ লেনিন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর আজীবন বন্ধু ম্যাক্সিম গর্কি পর্যন্ত খানিকটা ভাববিলাস ক'রে ফেলেছেন। সে ভুল এড়িয়ে গেলেই আমরা তাঁব ব্যক্তিগত জীবনের অবদান বুঝতে পারবো। ষ্টালিন একবার বলেছিলেন যে, নেতৃত্ব কায়েম করার জন্য কোনো রকমের আড়ম্বর করতে লেনিনের অতি বড় শত্রুও তাঁকে দেখেনি। তাঁব চেহারা কিছু অসাধারণ ছিল না; বড় বড় আত্মম্ভরী নেতাদের মতো দেরী ক'রে সভায় এসে নিজেদের প্রতিপত্তি জাহির করা তাঁব কোষ্ঠীতেই লেখা হয়নি; বাগাড়ম্বরে সকলকে হকচকিয়ে দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল না। যথাসময়ে সভায় পৌছে, সকলের সঙ্গে সাধারণভাবে আলোচনা ক'রে, যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজের বক্তব্য পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ তিনি করতেন। আর তাঁর ছিল অসাধারণ চরিত্রবল; আলোচনায় হার হলেও যেমন তিনি ব্যতিব্যস্ত হতেন না জিত হলেও তেমনি অতিরিক্ত উৎফুল্ল হতেন না; কাজে যাতে গাফিলি না ঘটে, সেদিকেই তাঁর লক্ষ্য সর্বদা থাকত। ১৯০৯ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বলশেভিক দলে বেজায় ভাঙ্গন ধরেছিল; বড় বড়

নেতারা নৈরাশ্যের সুর ধরেছিলেন, দলকে শুধু আইনসঙ্গতভাবে চালানোর একটা চেষ্টা দলের মধ্যে হচ্ছিল। সেই সংকট সময়ে লেনিন একা দল আর দলের মতবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য লড়েছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত তাঁরই জিত হয়েছিল। আবার দেখা যায় যে ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তাঁর লড়্‌তে হয়েছিল সাম্যবাদী দলের প্রাক্তন নেতাদের সঙ্গে। মহাযুদ্ধের হিড়িকে তাঁদের বৈপ্লবিক বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, পুঁজিবাদের বহুরূপী আকর্ষণে তাঁরা সাম্যবাদকে কাজের ক্ষেত্রে বর্জন করছিলেন। তখন প্লেখানভ, কাউট্স্কি প্রভৃতি বহুমানভাজন নেতার বিরুদ্ধে তিনি প্রচার চালিয়ে যেতে সংকোচ বোধ করেননি, কারণ তা'ছাড়া সাম্যবাদী আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোনো উপায় ছিল না। জনসাধারণের যেমন তিনি নেতা ছিলেন, তেমনি জনসাধারণের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অসাধারণ। রুষদেশে নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বে তাঁকে আর তাঁর অনুচরদের জার্মান গোয়েন্দা ব'লে কুৎসা করা হ'ত। রুষ বুর্জোয়াশ্রেণী ইংরাজ-ফরাসীর তাঁবে থেকে লড়াই চালাবার জন্য ব্যগ্র ছিল, নিঃস্ব চাষী-মজুরদের জোর ক'রে টেনে এনে লড়াইয়ে লাগাচ্ছিল, আর পশ্চিম ইয়োরোপের "সুসভ্য" সোশালিস্টরা নিজেদের দেশের পুঁজিবাদী সরকারের পক্ষে লড়াইকে সমর্থন করছিল। তখন লেনিন সাম্যবাদী আন্দোলনের এই আত্মঘাতী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন, সোভিয়েট গণতন্ত্র স্থাপন ক'রে দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের যে ঘাঁটি তৈরী করলেন, তা তাঁর কর্মবীরত্বের নিদর্শন হয়ে রইল। জনসাধারণ কী চায়, সে সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ছিল ব'লেই এরকম দুঃসাহস দেখাবার জোর তাঁর হয়েছিল।

১৮৯৯ সালে যুবক লেনিন "আমাদের কর্মসূচী" নাম দিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে মার্ক্‌সবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রবন্ধটীতে এক জায়গায় আছে :—"আমাদের বহু গঞ্জনা সহ্য করতে হবে,

অনেকে বলবেন যে, আমরা সাম্যবাদী দলকে নিষ্ঠা-সর্ব্বস্ব ধর্মযাজকের দলে পরিণত করেছি, 'সত্যধর্ম' থেকে বিচ্যুতির নামে যাঁরা স্বাধীন চিন্তা করেন তাঁদের 'ধর্মভ্রষ্ট' অপবাদ দিচ্ছি। এসব কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, কিন্তু আমরা তাকে শুধু প্রলাপ মনে করি। তাদের কথায় কোনো সত্য নেই, এক তিলও সত্য নেই। বিপ্লবী চিন্তাধারা না থাকলে শক্তিমান সোশালিস্ট দল অসম্ভব .. যদি আমরা মার্ক্সবাদের সত্যতা সম্বন্ধে স্থিরবিশ্বাস হয়ে বিরোধীদের অযথা আক্রমণকে প্রতিহত করি, মার্ক্সবাদকে খর্ব করার সবল চেষ্টাকে ব্যাহত করি, তাহলে যে আমরা সমালোচনামাত্রেরই শত্রু, তা প্রমাণ হয় না। এমন কি, আমরা মনে করি না যে মার্ক্সবাদ এখনই একেবারে সর্বাঙ্গপুষ্ট হয়ে উঠেছে ; আমরা শুধু বিশ্বাস করি যে, সাম্যবাদীরা জীবনের পিছনে না পড়ে থেকে যে-বিজ্ঞানের বলে নানাদিকে অগ্রসর হতে পারবেন, সেই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছে মার্ক্সের মতবাদ। আমরা মনে করি যে, বিশেষ ক'রে রুষদেশে সাম্যবাদীরা মার্ক্সবাদকে স্থানীয় অবস্থানুযায়ী প্রয়োগ করবেন, কারণ মার্ক্সবাদ শুধু মোটামুটি সমাজব্যবস্থা ও তার রূপান্তর সম্বন্ধে কয়েকটি বিধির কথা বলেছে, যার প্রয়োগ ইংলণ্ড বা ফ্রান্স বা জার্মানীতে বিভিন্নরূপেই ঘটবে।"— এ কথাগুলো মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা দূর করবে।

মার্ক্সবাদের "ভেজাল" সম্বন্ধে লেনিন সর্বদাই খুব সতর্ক থাকতেন। তাই বহুবার তিনি যেসব "নেতা" ধনিকদের সঙ্গে শান্তিতে থাকার আশায় মার্ক্সবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচারে ব্যস্ত হতেন, তাঁদের যথার্থ রূপ প্রকট ক'রে দিতেন। তাই তাঁর শিষ্য, স্টালিন একবার যথার্থই বলেন যে "গোলাপজল ছড়িয়ে কখনও বিপ্লব করা চলে না, আর রেশমের দস্তানা হাতে চড়িয়ে লড়াই করা চলে না।" উনিশ শতকের শেষে ইংরেজ ফেবিয়ানদের প্রভাবে পড়ে মার্ক্সবাদী পণ্ডিত বের্ণস্টাইন সাম্যবাদকে

মেজে-ঘষে "ভদ্রস্থ" করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের ক্ষণস্থায়ী প্রসারে ভুলে স্থির করেছিলেন যে, পার্লামেন্টের মারফৎ গরম বক্তৃতায় সাম্যবাদকে আহ্বান ক'রে ধীরে-সুস্থেও বস্তুটার আমদানি করা চলবে; আর বিপ্লব ব্যাপারটা ভুয়ো, একেবারে অ-দরকারী। আবার বহুকাল ধ'রে যিনি মার্ক্স্‌বেত্তাদের শিরোমণি ব'লে পরিচিত ছিলেন, সেই বিরাট পণ্ডিত কাউট্‌স্কির পদস্খলন ঘটল ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময়; যুদ্ধকে তিনি সমর্থন করলেন। নিজের দেশের বড়লোকদের স্বার্থ-যে সাম্যবাদী আন্দোলনের পক্ষে পরম হানিকর, তা বুঝতে চাইলেন না। কাউট্‌স্কির বিরুদ্ধে লেনিন নির্দয়ভাবে প্রচার চালাতে পশ্চাদ্‌পদ হন'নি। আবার যখন হিল্‌ফারডিং প্রমুখ কয়েকজন "অতি-সাম্রাজ্যবাদের" (Ultra-imperialism) নামে মার্ক্স্‌বাদের কদর্থ করতে লাগলেন, নিজেদেরই অন্তর্দৃষ্টির কথা ছাড়া যাক, দূরদৃষ্টিরও অভাব দেখালেন, বিপ্লবভীরুর মতো ধনিকবাদের সাময়িক সাফল্য দেখে মার্ক্স্‌বাদ থেকে বিচ্যুত হলেন, পরোক্ষভাবে ধনিকদের অনুচর হয়ে কাজ করলেন, তখন তাঁদের কষাঘাত করেছিলেন লেনিন। রুষদেশে লেনিনের গুরু ছিলেন প্লেখানভ; কিন্তু তিনিও যখন ১৯১৪ সালে স্বাদেশিকতার মোহে পড়ে সাম্যবাদ থেকে বিপথগামী হয়েছিলেন, তখন লেনিন তাঁর সম্বন্ধে নির্মম সমালোচনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। পরে আবার ট্রট্‌স্কি, জিনোভিয়েফ, কামেনেফ, বুখারিণ, রাডেক প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর মতভেদ হয়েছিল। প্রতিবারেই তিনি মার্ক্স্‌বাদের যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বিপথগামীদের মার্জনা করা বিপ্লবী লেনিনের স্বভাব ছিল না।

মার্ক্স্‌বাদী দর্শনকে যাঁরা বিকৃত করার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে লেনিন ছিলেন খড়্গহস্ত। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের পণ্ডিতধুরন্ধররা যখন মার্ক্স্‌বাদের বিপ্লবী সত্তাকে নির্জীব ক'রে রাখছিল, সাম্যবাদী সমাজ

অবশ্যম্ভাবী ব'লে সাম্যবাদীদের বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে নিষ্প্রয়োজন ব'লে প্রচার করছিল, তখন লেনিন তাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত অভিযান চালিয়েছিলেন ; ধনিক সমাজ-যে আপনা থেকেই ধ্বংস হবে না, তাকে-যে গণশক্তিবলে ধ্বংস করতে হবে, তা সকল সাম্যবাদীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

লেনিন শুধু সাম্যবাদের ব্যাখ্যাই করেননি, সাম্যবাদের পরিধির বিস্তারও ঘটিয়েছিলেন। তাই তাঁর কাজ হয়েছিল মার্ক্সবাদকে ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, সাম্যবাদকে যাতে ধনিক সমাজের নূতন বিন্যাসে অক্ষুণ্ণভাবে প্রয়োগ করা চলে, তার চেষ্টা। স্টালিন যাকে **লেনিনবাদ** বলেছেন, তার সংজ্ঞা তাই হচ্ছে—"সাম্রাজ্য-বাদ আর প্রলেটেরিয়ন বিপবের যুগে মার্ক্সবাদ।"

লেনিন দেখিয়েছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার যায়গায় এসেছে একচেটে অধিকার (Monopoly), আর এসেছে—ব্যাঙ্কের পুঁজি আর শিল্পের পুঁজি একত্র মিলে যাওয়ার ফলে ফিনান্স-ক্যাপিটালের রাজত্ব, পুঁজিদারী সামন্ত গোষ্ঠীর সৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াদের একাধিপত্য ক্রমে প্রকট হচ্ছে, ফ্যাশিজমের নগ্নরূপ পরিগ্রহ করছে, প্রধান সাম্রাজ্যতন্ত্রগুলি সাম্রাজ্যের মুনাফার সামান্য অংশ দিয়ে উচ্চ স্তরের শ্রমিকদের অন্তত কিছুকাল সন্তুষ্ট করতে পারলেও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে ধনিকতন্ত্রের মৌলিক অন্তর্বিরোধের– ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষের—নিরাকরণ ঘটছে না। মূলধনের শক্তি বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রাচীন রীতি অনুসারে শুধু ট্রেড ইউনিয়ন আর পার্লামেণ্টকে ব্যবহার ক'রে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করার আশা নষ্ট হয়েছে। তাছাড়া ধনিকবাদ সর্বত্র সমানভাবে বিকাশ পায়নি ব'লে যেসব ধনিক শক্তি সম্প্রতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তাদের সঙ্গে প্রাচীন ও বলশালী ধনিকরাষ্ট্রের মধ্যে বিষম প্রতিযোগিতা চলেছে।

মহাযুদ্ধ বিনা তার অবসানেরও উপায় নেই। আবার পরাধীন দেশগুলিতেও নূতন ধনিকশ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী উদ্ভব ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শ্রমিক আন্দোলনও জেগে উঠেছে, সর্বত্র বিপ্লবী পরিস্থিতি হাজির হচ্ছে। তাই সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে ধনিকবাদের শেষ স্তর, চূড়ায় আরোহণের পর পতন ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই। সাম্রাজ্যতন্ত্র অবশ্য বিপ্লবীদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিমান্। কিন্তু তার মারাত্মক দোষ হচ্ছে অনৈক্য। সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পর বিরোধের শান্তি নেই, আর বিপ্লবীদের হাতিয়ার হচ্ছে আন্তর্জাতিক ঐক্য। বিপ্লবীদের অস্ত্র হল মার্ক্‌স্‌বাদ, আর ১৯১৭ থেকে তাদের পুরোধা হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্থাপনার সময় থেকে ধনিকরা অক্লান্ত প্রচার ক'রে এসেছে যাতে দুনিয়ার শ্রমিক-আন্দোলন সোভিয়েটের শত্রু হয়ে পড়ে, আর ধনিকদের কর্তৃত্ব বজায় থেকে যায়। এই সেদিন পর্যন্ত তাই সাম্যবাদীদের আন্তর্জাতিক ঐক্য ভাঙার জন্য সোভিয়েট-বিরোধ প্রচার দারুণভাবে চলেছে, আর যথারীতি দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের নেতারা ধনিকদের অনুচর হয়ে সোভিয়েট-বিদ্বেষের বিষোদ্গার করছেন। এ বিষয়ে লেনিনের মৃত্যুদিনে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার।

লেনিন চেয়েছিলেন যে সাম্যবাদী দল যেন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব করে, শ্রমিকশ্রেণীর লেজুড় হয়ে পড়ে না থাকে। দল হবে গণশক্তির সমরবাহিনী, শ্রমিকদের শ্রেণীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। জনসাধারণ সকলেই দলের অন্তর্ভুক্ত যে হবে, তা নয়, কিন্তু তারা যেন দলের নেতৃত্বে নিশ্চিন্ত নির্ভর করতে পারে, দলকে যেন তারা নিজেদের জিনিষ ব'লে মনে করে। দলের সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্যকে লঙ্ঘন করতে দেওয়া হবে না, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর যে-একাধিপত্য ধনিকযুগ থেকে সমাজকে সাম্যবাদের যুগে নিয়ে যাবে, তার প্রধান অস্ত্র হবে এই দল, রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করবে এই দল। সুবিধাবাদী ও চক্রান্তকারীদের তাই দূর করতে হবে, সম্পূর্ণ-স্বাধীন আলোচনার পর দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের

পরও যারা বিবাদ-বিসংবাদ চালাবে, তাদের যথাযোগ্য শাস্তি দিতে হবে।
"যে সব নেতারা বিপ্লবী কর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধা করবেন, তাঁদের দূর করলে শ্রমিক-আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন দুর্বল না হয়ে শক্তিমান হয়ে উঠবে।" লেনিনের গড়া দল সোভিয়েট ইউনিয়নে নূতন সমাজ সৃষ্টি করবার চেষ্টায় অসাধ্য সাধন করেছে, ট্রট্স্কির মতো যাঁরা আত্মম্ভরী ভাববিলাসের মোহে বিপ্লবী সেজেছিলেন আর পথের সন্ধানের জন্য সগর্বে নির্ভর করেছিলেন শুধু পাণ্ডিত্য ও চমকপ্রদ বাগ্মিতার উপর, তাঁদের বিষম পদস্খলনের শাস্তি দিয়েছে। লেনিনের বিধান সাম্যবাদী দলমাত্রেরই-যে কত প্রয়োজন, বিপ্লবী অভিজ্ঞতাই তার সাক্ষ্য দিবে।

* * *

লেনিন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন স্কুলমাস্টার, আর তাঁর মা ছিলেন এক ডাক্তারের মেয়ে। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টায় অভিযুক্ত হয়ে তাঁর দাদার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। লেনিনের জীবনে এ ঘটনা অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদকে তিনি কখনও আমল দেননি; মজদুরসংস্থাকে হাতিয়ার ক'রে নতুন দুনিয়া গড়ার কাজই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ১৯১৭ সালে সোভিয়েট বিপ্লবের সময় তাঁর এ ব্রতের উদযাপন হল।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার সময় ছাত্র-আন্দোলনে লেগেছিলেন ব'লে অঠোরো বৎসর বয়সে তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়। প্রায় দু'বছর পরে তিনি ফিরে আসার অনুমতি পান। আইন পরীক্ষা পাশ করার পর সামারা বা বর্তমান কুইবিশেভ্ শহরে তিনি কিছুকাল আইন ব্যবসায়ে লেগেছিলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় তাঁর নাম মাত্র ছিল। আসলে তিনি সাম্যবাদ ও শ্রমিক-আন্দোলনে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১৮৯৫ সালে রুষদেশের বাইরে গিয়ে তিনি প্লেখানভ প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ সাম্যবাদীদের সংস্পর্শে আসেন। সেণ্ট পিটার্সবার্গে ফিরে শ্রমিক-আন্দোলনে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮৯৬ সালটা লেনিন জেলে কাটান্। ১৮৯৭ থেকে তিন বৎসরকাল তাঁকে পূর্ব সাইবীরিয়াতে আটক থাকতে হয়। এই নির্বাসনের সময় তিনি তাঁর সহকর্মী ক্রুপ্‌স্কায়াকে বিবাহ করেন। আর তখনই রুষদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার জন্য মালমসলা সংগ্রহ করেন। ১৯০০ সালে তিনি সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়ে সেখান থেকে রুষদেশে প্রচারের জন্য 'ইস্‌ক্রা' বা 'স্ফুলিঙ্গ' নামে বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশ করেন। যে লেনিনবাদের কথা আগে বলা হয়েছে তার প্রথম প্রচার এই কাগজের মারফৎ হতে থাকে।

১৯০৩ সালে বেলজিয়মের ব্রাসেল্‌স্ শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে লণ্ডনে গিয়ে রুষ-সাম্যবাদীদের দ্বিতীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল। এই সময় তাদের মধ্যে দারুণ মতভেদ চলছিল। মতভেদের ফলে দুটো দলের সৃষ্টি হল। যারা সংখ্যায় কম ছিল, তারা মেন্‌শিভিক্—ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে একটা আপোষ মেনে নেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল। যারা বেশি ছিল তাদের বলা হল বল্‌শেভিক্। লেনিন এই দলের নেতা হলেন।

১৯০৫ সালে রুষ-জাপান যুদ্ধে রুষের পরাজয়ের পর একটা বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন চারিদিকে চাষী-মজুরদের মধ্যে ধর্মঘট চলে। ১৯০৫ সালের জানুয়ারীতে নিরস্ত্র শ্রমিকরা যখন মিছিল ক'রে তাদের অভাব অভিযোগ জানবার জন্য সেণ্টপিটার্সবার্গের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন জারের পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়, অনেকে হতাহত হয়। এই বৎসরই রুষদের নানা জায়গায় মজুরদের পঞ্চায়েৎ বা সোভিয়েট মিউনিসি-প্যালিটি দখল ক'রে মজুররা শহর চালাতে আরম্ভ করে। কিন্তু বিপ্লব সেবার সফল হয়নি, সোভিয়েট-আন্দোলনও নষ্ট হয়েছিল।

অসাফল্য সত্ত্বেও ১৯০৫ সালের বিপ্লব থেকে যে-শিক্ষা পাওয়া গেল লেনিনের নেতৃত্বে রুষদেশের সাম্যবাদীরা সে শিক্ষা প্রয়োগ করল ১৯১৭ সালে।

১৯০৭ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত লেনিন আবার রুষদেশের বাইরে থাক্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু রুষ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করার গুরুভার তিনি কখনও পরিত্যাগ করেননি। এই সময় রুষ পালামেণ্ট বা ডুমার মধ্যে কয়েক-জন বলশেভিক্‌কে পাঠিয়ে বিপ্লবের কাজে শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা তিনি করেছিলেন। দলের মধ্যে কেউ কেউ এ পদ্ধতির নিন্দা করেন, বলশেভিক্‌দের কাছে 'ডুমা' একেবারে অস্পৃশ্য হওয়া উচিত ব'লে প্রচার করেন। কিন্তু লেনিন ও দলের অধিকাংশের মত হল এই যে, বিপ্লবকে সফল করতে হলে পার্লামেণ্টের মতো বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা। মার্কস্‌বাদ একটা বাঁধা বুলি নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগই হচ্ছে সাম্যবাদীদের কর্তব্য।

এই সময় অপর অনেকে চাইলেন যে কেবল খোলাখুলি ভাবে আন্দোলন চালানোই উচিত, জারের সরকারের চোখ এড়িয়ে যাবার জন্য দল যে-গোপন কাজকম করত তা বন্ধ করাই ঠিক। কেউ কেউ আবার জনসাধারণকে বিপ্লব ব্যাপারে নিরুৎসাহ দেখে সন্ত্রাসবাদের পুনর্জীবনের চেষ্টায় লাগলেন। এই দুই দলের বিরুদ্ধে লেনিনকে লড়্‌তে হয়েছিল।

তাছাড়া এই সময় লেনিন কেবলই যাঁরা মার্ক্‌সের মতে ভেজাল ঢোকাবার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের মত খণ্ডন করার জন্য ছোট-বড় বই লিখে যাচ্ছিলেন। মার্ক্‌স্‌বাদের যথার্থ ব্যাখ্যা ও সেই অনুসারে কাজ লেনিন সারা জীবন ক'রে গেছেন। জ্ঞানবীর ও কর্মবীরের এমন সমাবেশ কখনও দেখা গেছে ব'লে জানা নেই।

১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল, তখন ইয়োরোপের সমস্ত দেশে শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী ব'লে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই পদস্খলন ঘটল। অলীক দেশভক্তির মোহে পড়ে তাঁরা নিজের নিজের দেশের

মালিকদের স্বার্থকে বিশ্বের শ্রমিকদের স্বার্থের চেয়ে বড় ক'রে দেখলেন, নিজের নিজের দেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন করলেন। সুইট্জারল্যাণ্ডে ৎসিমেরভাল্ড্ আর কিয়েন্থাল নামে দু'টো জায়গায় যুদ্ধবিরোধী সাম্যবাদীদের সভা হয়েছিল। সেখানে লেনিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে প্রত্যেক দেশে অন্তর্যুদ্ধে পরিণত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের গোড়াপত্তন এখানেই হয়েছিল। দ্বিতীয় (বা সোশালিস্ট) ইণ্টারন্যাশন্যাল যুদ্ধের সময় প্রায় বিকল হয়ে গিয়েছিল। এর অধীনে নানা দেশে যেসব দল ছিল, তারা নিজের নিজের দেশের যুদ্ধজয় চেষ্টায় লেগেছিল, বিপ্লব বা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্যের কথা ভাবার সময় পায়নি।

মুষ্টিমেয় সহকর্মী নিয়ে লেনিন তাঁর ঘোষণা পত্র প্রচার করলেন—"মার্ক্সপন্থী বিপ্লবীরা দলের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সুবিধাবাদী ও যুদ্ধরত সমাজতন্ত্রীদের বাদ দিয়ে আমাদের এক নতুন বিপ্লবী আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গড়তে হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মতবাদ, সুবিধাবাদীদের দ্বারা ভূলুণ্ঠিত। সুবিধাবাদের পতন হোক, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পতাকা উত্তোলিত হোক।"

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রুষদেশের উচ্চ-মধ্যশ্রেণী মহাযুদ্ধের পরিচালনা ব্যাপারে বিষম অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল। আসন্ন বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখার আশা না থাকায় জার সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এ বিপ্লবের খবর পেয়ে লেনিন দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হলেন, কিন্তু ফেরবার পথে মুস্কিল ছিল অনেক। ইংরেজ আর ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাঁদের এলাকার মধ্য দিয়ে লেনিনকে ফিরতে দিতে রাজী ছিলেন না, রুষদেশের অস্থায়ী সরকারও বলশেভিক নেতাকে আবার দেশে দেখবার জন্য একেবারেই ব্যস্ত ছিল না। শেষকালে জার্মান কর্তৃপক্ষ রাজী হল যে, একটা বন্ধ গাড়ীতে লেনিন ও তাঁর সহকর্মীদের

রুষদেশে ফিরে যেতে দেওয়া হবে, কিন্তু রাস্তায় তাঁরা জার্মানীর কোথাও কারও সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে পারবেন না। এই ভাবে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড ঘুরে ১৯১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল তিনি পেট্রোগ্রাডে নামলেন।

পরের ছ'মাস ধরে লেনিনের কাজ হল, যারা গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে আসলে জনসাধারণের দাসত্ব কায়েম করবার মতলবে ছিল, তাদের হারিয়ে বিপ্লবী শাসনব্যবস্থার জন্য দেশকে তৈরী করা। তিনি স্পষ্ট দেখেছিলেন যে শীঘ্রই যুদ্ধক্লান্ত, অভুক্ত জনসাধারণ আর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে না, আর সোভিয়েটগুলিতে তাদের নেতা হিসাবে বলশেভিকরা অধিকাংশ জায়গা অধিকার ক'রে বিপ্লবী-ব্যবস্থা আনতে পারবে। প্লেখানভ্ লেনিনকে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু লেনিন তাতে পিছপাও হলেন না, "প্রাভ্দা" কাগজ মারফৎ ও অন্যান্য নানা উপায়ে প্রচার চালাতে লাগলেন।

জুলাই মাসে লেনিনকে "জার্মান গোয়েন্দা" অপবাদ দেওয়া হল, পেট্রোগ্রাডে জনসাধারণের বিক্ষোভকে একেবারে নিষ্পিষ্ট করা হল। লেনিন আবার লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে কাজ চালাতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু জাগ্রত গণশক্তির অগ্রগতি এখন আর কারও রোধ করার শক্তি রইল না। পেট্রোগ্রাডে আর মস্কো সোভিয়েটে বলশেভিকরা সংখ্যায় সব চেয়ে বড় দল হল। লেনিন বিপ্লবী কর্মসূচী দেশের সামনে রাখলেন, বিপ্লবের ভেরী বেজে উঠল—সারা দেশে নতুন এক আওয়াজ উঠল, 'সমস্ত শক্তি সোভিয়েটের হস্তগত হোক্', 'যুদ্ধ নিপাত যাক্', 'জমি চাষীদের হোক্', 'নিরন্নদের অন্ন হোক্', 'সোভিয়েট হোক্ সর্বময় কর্তা'—রুষদেশের সর্বত্র এই কথা শোনা যেতে লাগল।

৭ই নভেম্বর সোভিয়েট রাষ্ট্রশক্তি দখল করল। পৃথিবীর ইতিহাসে ঐ প্রথম মজুর-কিষাণের দল সমাজ থেকে শ্রেণীভেদ চিরকালের জন্য

দূর করে, শোষকদের নির্মমভাবে দখল করে। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

লেনিনের সহকর্মী ব'লে যাঁরা পরে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান কয়েকজন এ সময় তাঁকে বড় কম বাধা দেননি। ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েফ, কামেনেফ্ প্রভৃতি কখনও লেনিনের কর্মপদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেননি। তাই তাঁরা আসন্ন বিপ্লবের সময়ও তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে একেবারেই মনস্থির করেননি। লেনিনের বিরাট ব্যক্তিত্ব তাঁর শিষ্যদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে স্টালিনের একাগ্র কর্মক্ষমতার ভিতর দিয়ে, তখন বিপ্লবের আয়োজনে প্রযুক্ত না থাকলে হয়তো ১৯১৭ সালের প্রচণ্ড বৈপ্লবিক সুযোগও নষ্ট হয়ে যেত।

রণক্লান্ত রুষদেশকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনতে না পাবলে বিপ্লব আবার বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। তাই লেনিন, ট্রট্স্কির মতো সহকর্মীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত জার্মানীর সঙ্গে যে সন্ধি হল, তার সর্তগুলি রুষদেশের পক্ষে একেবারেই সুবিধাজনক হয়নি। কিন্তু সন্ধি না হলে সাম্যবাদ প্রবর্তনের কোনো আশাও থাকতো না; তাই লেনিন শান্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কবেছিলেন, ট্রট্স্কির মতো উগ্রপন্থী কম্যুনিষ্টের আপত্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন, অনেকের অপবাদও মাথায় পেতে নিতে রাজী ছিলেন। সন্ধি-বিরোধীরা তাঁর কথা আগে মেনে নিলে সর্তগুলি রুষদেশের পক্ষে অনেক বেশী অনুকূল যে হ'ত, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

সোভিয়েট শাসনের আরও কঠিন পরীক্ষা এবার আরম্ভ হল। অধিকারচ্যুত অভিজাত ধনিকশ্রেনী এবং তাদের অনুবর্তী সমস্ত দল তাদের পুঞ্জীভূত আক্রোশ চরিতার্থ করবার জন্য পশ্চিম ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির কাছ থেকে অর্থ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য অপেক্ষা না ক'রেই ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও আমেরিকা

রুষদেশে সোভিয়েট শাসন ভেঙে দেওয়ার জন্য সৈন্য পাঠিয়ে দিল। এমন সময় গিয়েছে যখন একদিকে পোলাণ্ডের প্রান্ত থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত, আর অন্যদিকে কাশ্মীর ও আফগানিস্থানের সীমান্ত থেকে উত্তরমেরু পর্যন্ত একসঙ্গে চৌদ্দটী ধনিক শক্তি সোভিয়েট উৎপাটনে ব্যাপৃত হয়েছিল। অনেকের পক্ষে হয়তো এটা বিশ্বাস করাই শক্ত, কিন্তু ইংরেজ, জাপানী, আমেরিকান, ফরাসী, ইতালিয়ান, চীনা, গ্রীক, পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, তুর্কি,চেকোশ্লোভাক, জার্মান, অষ্ট্রীয়ান, পোলিশ যোদ্ধা এসে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল। দেনিকিন, কল্‌চাক, যুদেনিচ, রাঙ্গেল প্রভৃতি বিদ্রোহী রুষ-সেনানায়করা বিদেশীদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য পাচ্ছিল। জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রীরা যেমন চীনে তথাকথিত "স্বতন্ত্র" শাসনব্যবস্থা খাড়া করেছে, প্রাক্তন রুষ সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশে সোভিয়েট-শত্রুরাও তাই করেছিল। উত্তরে আর্কএঞ্জেল ও মুরমান্সক্‌, দক্ষিণে ককেশস ও ডন্‌ অঞ্চল, পূর্বে সাইবীরিয়ার নানা প্রদেশ, যুরাল পর্বতের নিকটস্থ জায়গা, বোখারা সামারকন্দ অঞ্চল—এরূপ বহুস্থলে বিদেশী আশ্রয়ে সোভিয়েট-বিরোধীদের শাসন কায়েম করার চেষ্টা হয়েছিল। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সোভিয়েটে এই নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষা চলেছিল। এমনকি তার পরেও জাপান ১৯২২ পর্যন্ত ভ্লাডিভষ্টক বন্দর ছাড়েনি, আর ১৯২৪-এর আগে উত্তর-শাখালিন ছেড়ে যায়নি।

গৃহযুদ্ধ আর বিদেশী শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপকে ব্যর্থ ক'রে দিল জাগ্রত সোভিয়েট গণশক্তি। দুনিয়ার শ্রমিকরাও তাদের পক্ষে আন্দোলন করেছিল, নিজেদের সরকারের উপর চাপ দিয়ে সোভিয়েট দলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিপ্লবের জয় হল প্রধানত সোভিয়েট জনসাধারণের অটুট তেজস্বিতার জন্য, আর সে তেজস্বিতাকে যারা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন লেনিন।

কিন্তু দীর্ঘ চার বৎসর প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের দারুণ শক্তিক্ষয় হয়েছিল। সংকট সময়ে সোভিয়েট সরকার অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে "সামরিক সাম্যবাদ" (War communism) প্রবর্তন করেছিল। তখন প্রধান প্রয়োজন ছিল সংগ্রামরত লালফৌজ আর দেশের অভুক্ত কৃষিজীবীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। তাই ছোট-বড় সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরকার পরিচালনা করে; ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের উদ্বৃত্ত অংশ সরকার বাঁধা দামে কিনে শ্রমিক ও সৈন্যদের জন্য সরবরাহ ও সঞ্চয় ক'রে রাখে। সকলকেই বলা হয় যে শ্রম না করলে আহার মিলবে না—সংকট সময়ে এ নিয়ম-যে নির্মম ভাবেই পালন করা হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

যতদিন যুদ্ধ চলেছিল, ততদিন শ্রমিক-কৃষক সব কথা ভুলে সোভিয়েট ভূমি রক্ষার জন্য খেটেছে, স্বার্থের কথা ভাবেনি। কিন্তু যুদ্ধবিরতির পর তাদের পক্ষে নির্বিকার চিত্তে অভাবের দংশন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। কৃষকরা উদ্বৃত্ত শস্য সরকারের হাতে তুলে দিতে আপত্তি করল, শস্য উৎপাদন কমাতে লাগল। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এমনকি যে-শ্রমিকশ্রেণী রাজনীতি ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সচেতন, তাদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। অবসাদখিন্ন জনসাধারণ আর স্বার্থকে সম্পূর্ণ বলি পুনর্গঠনের কাজে লাগতে পারল না। এই নতুন বিপদের সময় বলশেভিক্ দলের কর্তব্য হল দেশে প্রতিক্রিয়া ও বিপ্লববিরোধের মনোভাব যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সে চেষ্টা করা। লেনিন বললেন যে, নতুন পরিস্থিতিতে "সামরিক সাম্যবাদ" অচল, নতুন অর্থ-নৈতিক নীতি প্রচলন করতে হবে।

এই নীতি New Economic Policy (N. E. P.) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সমস্ত বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যানবাহনের ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, জমি, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ভার সরকারের হাতেই ন্যস্ত রইল।

কিন্তু "সামরিক সাম্যবাদের" উদ্বৃত্ত শস্য বাঁধা দরে কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা তুলে দিয়ে উৎপন্ন শস্যের উপর একটা কর বসানো হল। কর দিয়ে যা বাকী থাকত, তা কৃষক স্বেচ্ছায় সম্ভোগ করার অনুমতি পেল। ট্রট্স্কি প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদীরা বললেন যে, লেনিন এই নীতি অনুসরণ ক'রে সমাজ-তন্ত্রকে নির্বাসন দিলেন, ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করলেন। কিন্তু আসলে এতে শুধু কৃষির শোচনীয় দুর্গতি দূর হল, ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় স্বাধীনতা দেওয়ায় দেশের অর্থ-নৈতিক জীবন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। যারা শুধু বাগাড়ম্বরপটু, তাঁরা বললেন যে, লেনিন বিপ্লবকে বিপন্ন করছেন। তাঁরা বোঝেননি যে, লেনিন যে-পথের নির্দেশ দিলেন, তাই ছিল বিপ্লবকে রক্ষা করার একমাত্র পথ। পরে যাতে একসঙ্গে দু'পা এগিয়ে যাওয়া চলে, তাই তিনি এক পা পিছিয়ে এসেছিলেন।

এ দুঃসাহস দেখাবার ক্ষমতা ছিল বলেই মার্ক্সবাদী হিসাবে লেনিনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী সাম্যবাদের প্রয়োগ কিরূপ হওয়া উচিত তা জানার শক্তি না থাকলে কেউ যথার্থ সাম্যবাদী হতে পারে না।

এই সুযোগে লেনিনের মতের ব্যাখ্যা নিয়ে ট্রট্স্কির সঙ্গে স্টালিন ও অধিকাংশ রুষ সাম্যবাদীর যে বিসংবাদ চলেছিল, সে বিষয়ে আলোচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মতদ্বৈধের প্রধান কারণ ছিল, ট্রট্স্কির 'Permanent Revolution'-বাদ। তাঁর মতে প্রলেটেরিয়টের যে কেবল ধনিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে তা নয়, চাষীদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের বিরুদ্ধে যাবে। সুতরাং যে-সমস্ত পশ্চাদ্পদ দেশে চাষীদের সংখ্যাধিক্য প্রবল, সেখানকার সমাধান তখনই হতে পারবে যখন সমস্ত পৃথিবীতে প্রলেটেরিয়ট বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করেছে। এর এক অর্থ এই যে, বিপ্লবী সোভিয়েট রক্ষণশীল ইয়োরোপ বর্তমান থাকা পর্যন্ত কিছুতেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না।

ইয়োরোপের শ্রমিকশ্রেণী রুষদেশকে সাক্ষাৎ সাহায্য না করলে সেখানে সাম্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। অন্তত ইয়োরোপের প্রধান সব দেশে শ্রমিকদের জয় না হলে রুষদেশে নতুন সমাজসৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

লেনিনের লেখা থেকে বোঝা যাবে যে প্রলেটেরিয়ন ডিক্‌টেটরশিপের ভিত্তি হচ্ছে নগর ও গ্রামের সকল শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ মিলন; মিলের কুলী আর মাঠের চাষীকে এক নিশানের তলায় দাঁড় করাতে হবে। ট্রট্‌স্কি এদের আলাদা তাঁবুতে ঠেলে দিয়েছিলেন। বিপ্লবে চাষীদের যে অনেকখানি জায়গা নেবার আছে, তা তিনি উড়িয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে তাদেরই সাহায্য করেছেন যারা চাষীদের বিপ্লব আন্দোলনে ডাক দিতে নারাজ। আর দ্বিতীয়ত, লেনিনের মতে ধনিকবাদের একটা নিয়মই হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে অসমান, তার রেখা অবক্র, মসৃণ বা ঋজু নয়, কোথাও কম কোথাও বেশি—এই তার স্বভাব। সুতরাং এ অবস্থায় কয়েকটি বা এমনকি একটীমাত্র দেশেও সাম্যবাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। গত মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৮) লেনিন মনে করেছিলেন যে ঐ বিকট তাণ্ডবের অবিশ্বাস্য ক্রূরতা ও নির্বুদ্ধিতা দেখে সকলের চক্ষুরুন্মীলন হবে, বিপ্লব কেবল সর্বব্যাপী হবে না, সর্বত্র সফলও হবে। "এক দেশে সমাজতন্ত্র" সম্ভব কি না—সে বিচার নিষ্প্রয়োজন হবে। কিন্তু ইতিহাসের সিদ্ধান্ত হল ভিন্ন, আর সোভিয়েট ইউনিয়ন স্থাপন ও পরিচালন ব্যপদেশে তাঁর অভিজ্ঞতা পুরাণো মতের পরিবর্তন এনে দিল।

মার্ক্‌স্‌ একবার তাঁর এক চিঠিতে বলেছিলেন যে, "এক দেশে সমাজতন্ত্র" (Socialism in one country) সম্ভব কি না সন্দেহ। কিন্তু লেনিন আর স্টালিন দেখলেন যে অন্তত রুষদেশ সম্বন্ধে তাঁরও মত ঠিক ঘটছে না। মার্ক্‌স্‌ যে-অর্থে "এক দেশ" কথা দু'টো ব্যবহার করেছিলেন, সে অর্থে সোভিয়েট ইউনিয়ন একদেশ মাত্র নয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে এক বিরাট

মহাদেশ যা প্রায় সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে পারে। ভৌগলিক বহিরাকৃতি (configuration) যার সহায়, যেখানে ধনোৎপাদনের সুযোগ প্রায় অফুরন্ত, যেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা অনেক অগ্রগামী দেশের তুলনায় সহজে পরিবর্তন সাপেক্ষ,—সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এক কথা, আর ধনিকজগতের বৈরিতা অগ্রাহ্য ক'রে ইংলণ্ডের মতো সুসংহত, বাণিজ্যনির্ভর দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা আর এক কথা। এই জন্যই লেনিন একবার বলেছিলেন যে, রুষদেশের তুলনায় পশ্চিম ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন সময়সাপেক্ষ, কিন্তু সেখানে ভিৎ একবার ভাল ক'রে খুড়তে পারলে রুষদেশের চেয়ে ঢেব তাড়াতাড়ি পাকা ইমারৎ উঠে যাবে।

অবশ্য "Socialism in one couutry"—একথা শুনে সহজ প্রেরণা বেশি আসে না। তবে যাদেব প্রেবণা কতকগুলো গবম কথা, তাদের দাম সাম্যবাদীদের কাছে খুবই কম। আব সকলেই জানেন যে, পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে যে প্রচেষ্টা অদম্য উদ্যমে চলে এসেছে, তার সাফল্যের চেয়ে বড় প্রেরণা শ্রমিক-আন্দোলনের আর কিছু নেই। মার্ক্‌সবাদ জড় বিশ্বাস নয়, জীবন্ত আন্দোলন; তাব রীতি, তাব বিধি স্থাণু নিশ্চল নয। তাই ব্রেষ্টলিটভস্ক্‌ সন্ধির সময ট্রট্স্কি যখন ব্যাকুল হয়ে লেনিনকে তার করেছিলেন যে, ঈভ্‌নিং পোষাক পরে সন্ধিসভায় তিনি প্রলেটেরিযন্ হয়ে কেমন ক'রে উপস্থিত হন, তখন উত্তর আসে যে যুদ্ধশান্তির জন্য যদি প্রয়োজন হয় তো 'পেটিকোট' পরে হাজির হও! তাই তাঁর New Economic Policy মার্ক্‌সবাদ থেকে সাময়িক বিচ্যুতি হলেও তিনি তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। স্টালিনও সেই পথ অনুসরণ ক'রে ট্রট্স্কির বিরুদ্ধবাদী হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে সমূহের স্বার্থই শ্রেয়, তাই দলের অবাধ্যতা করায় টট্স্কিব শাস্তি হয়েছিল। লেনিনের সময় যেমন Martov, Dan প্রভৃতি দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি স্টালিনের সমব ট্রট্স্কিকেও দেশ ছাড়তে হল। আরও যাঁরা

কেতাবে পড়া বাঁধাবুলি আউড়ে সোভিয়েটের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতিতে বাধা দিয়ে শুধু বিপ্লবী বাগাড়ম্বর দেখিয়েছিলেন, প্রকারান্তরে সোভিয়েট ধ্বংসের কাজেই সাহায্য করেছিলেন, তাঁদেরও বিপথগামিতার শাস্তি নিতে হয়েছে।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে মহামানব লেনিনের মৃত্যু হয়। ধনিক একাধিপত্যের চিরশত্রু লেনিনের মতো বিপ্লবী নেতা ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি। তাঁর নামে কত অপবাদ প্রচার করা হয়েছে, দানব বল-শেভিকদের রক্তপিপাসু নেতা ব'লে কতবার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু জন-সাধারণের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আর কোনও নেতা এত বেশি অর্জন করতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। লেনিনের অন্তরঙ্গ যাঁরা তাঁরা সকলেই বলেছেন যে তাঁর হৃদয় সত্যই ছিল কুসুমকোমল, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তাঁকে প্রাণ খোলা আনন্দ করতে যারা দেখেছে, তারা তা কখনও ভুলতে পারে না। এই হৃদয়বত্তার দরুণই তিনি চির নির্যাতিত কৃষক ও শ্রমিকদের মনের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন, আর সেই কারণেই কখনও তাদের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। আকৈশোর তিনি বিশ্বের আর্তদের যথার্থ মুক্তি সংঘটনের কঠোর ব্রত পালন ক'রে গিয়েছিলেন, বিপর্যয়ের মধ্যেও বিপ্লবের জয় সম্বন্ধে ভরসা রেখেছিলেন। এই স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের জীবন কথা মুক্তি-কামীদের কাছে চিরদিন অমূল্য হয়ে থাকবে।

মস্কো শহরে সোভিয়েট সৌধে লেনিনের যে প্রতিমূর্তির পরিকল্পনা হয়েছে, সেটা হবে মানুষের তৈরী সকল মূর্তির চেয়ে বড়ো। সোভিয়েট জনসাধারণ এই ভাবে তাদের অতি প্রিয় নেতার স্মৃতিকে সম্মান করছে। কিন্তু লেনিন শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন দুনিয়ার সর্বহারাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, দুনিয়ার সাম্যবাদীদের তিনি ছিলেন গুরু।

সোভিয়েট ইতিহাসের একটী অধ্যায়

কার্লমার্কস্ একবার তাঁর বন্ধু কুগেলমানকে লিখেছিলেন, "সকল সময়ই সাফল্য নিশ্চিত জেনে যদি সংগ্রাম চালানো যায়, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস সৃষ্টি করা একটা সহজ ব্যাপারই বটে।" আজকের দিনে দুনিয়ার নানা দেশে প্রগতিবিরোধীদের বিকট চক্রান্তের সাফল্য দেখে যাঁরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁদের একথা বিশেষ করে স্মরণ করা উচিত। বিপ্লবী সংগ্রাম যখন এগিয়ে চলেছে, তখন বিপ্লবী হওয়া সহজ, অনেকে তখন লণ্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা "টাইম্‌সের" মতো "ever strong on the stronger side," যেদিকে জোর সেইদিককেই সমর্থন করে থাকেন। কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতিতে যখন বাধা পড়ে, শত্রু যখন গণশক্তিকে পর্যুদস্ত করতে পারছে, তখনই হয় বিপ্লবী নেতৃত্বের পরীক্ষা। রুষদেশে ১৯১৭ সালের অক্টোবরের পূর্বে কিছুকাল ধরে বিপ্লব এগিয়ে চলছিল, জারের অসহ্য অপশাসন আর মহাযুদ্ধের পাশবিক তাণ্ডবের ফলে গণশক্তি জেগে উঠেছিল, তাকে রোধ করার শক্তি কারুর ছিল না। কিন্তু বিপ্লবী শাসনকে বিনাশ করাব জন্য যখন সমস্ত পৃথিবীর ধনিক রাষ্ট্রগুলি একযোগে আক্রমণ করল, অর্থ দিয়ে, যোদ্ধা দিয়ে, কামানবারুদ সরবরাহ ক'রে, বিদ্রোহী জার-পক্ষীয় সেনানায়কদের প্রভূত সাহায্য কবতে লাগল, তখন যাঁরা অক্টোবরে সোৎসাহে সংগ্রামে লেগেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। দেশ যখন অবসন্ন, জনসাধারণের অবস্থা যখন সঙ্গীন, রাষ্ট্র যখন শত্রুবেষ্টিত, যখন লেনিন বিপ্লবী কর্মনীতির ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কয়েক পা পেছিয়ে এসে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, তখন বহু বিপ্লবী বাগাড়ম্বরপটু বলেছিলেন যে, সাম্যবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে লেনিন

বিপ্লবকে বিপন্নই করছেন। তাঁরা বোঝেননি যে লেনিন যে-পথ ধরেছিলেন, তাই ছিল বিপ্লবকে রক্ষা করার একমাত্র পথ ; পরে যাতে একসঙ্গে দু'পা এগিয়ে যাওয়া চলে, তাই তিনি এক পা পেছিয়ে এসেছিলেন। লেনিনকে তখন যাঁরা বাধা দিয়েছেন (তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বিচার সম্প্রতি মস্কোতে হয়ে গেছে) তাঁরা বিপ্লবীর কর্তব্য জানতেন না, বিপদের দিনে বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে মনের যে শক্তি প্রয়োজন, তা তাঁদের ছিল না, নিরুৎসাহ হয়ে কেতাবে-পড়া বাঁধা বুলি আউড়ে দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতিতে বাধা দিয়ে তাঁরা বিপ্লবী আড়ম্বর মাত্র দেখিয়েছিলেন, কৃতিত্ব দেখাননি। সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাসে আরও কয়েকবার ঐ ধরণের "বিপ্লবী" হতাশ হয়ে সোভিয়েট-বিরোধের রাস্তাতেই এগিয়ে চলেছেন। 'পঞ্চবর্ষ সংকল্প' অনুসারে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠ ও আত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করেছিল, তখনও তাঁরা সংকল্প বিফল হবে ভেবে নিরুৎসাহ হয়েছিলেন। জার্মানীতে হিটলারের আবির্ভাব দেখে আবার তাঁরা সোভিয়েটের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে শেষে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন ; নিরুৎসাহ ভাব থেকে ক্রমে তাঁরা কর্তব্য স্খালনের সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাই বলা চলে যে, আপাত দৃষ্টিতে যখন বিপ্লবের সাফল্য বহুদূরপরাহত মনে হয়, তখন যে অকর্মণ্য ভাব, যে নিরুৎসাহ ঔদাসীন্য আসে, তার ফল অতি শোচনীয় হওয়া আশ্চর্য নয়। বিপদের দিনেই শক্তিপরীক্ষা ; বিপ্লব-যে সর্বদাই সহজ সাফল্য লাভ ক'রে চলবে, একথা ভাবা বাতুলতা।

বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতিতে এমন কতগুলো ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে— যার ফলে অনেকে বোধহয় নিরুৎসাহ হতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা যদি সোভিয়েট শাসনের ইতিহাস একটু অবহিত হয়ে পড়েন তো নিরুৎসাহ হওয়ার কোনো কারণ আর থাকবে না। চার বৎসর ধরে জারের প্রাক্তন

সাম্রাজ্যে সোভিয়েট অধিকারকে বিনাশ করার জন্য একদিকে পোলাণ্ডের প্রান্ত থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত, আর অন্যদিকে কাশ্মীর ও আফগানিস্থানের সীমান্ত থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত এক সঙ্গে চৌদ্দটি ধনিক শক্তি ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ, জাপানী, আমেরিকান, ফরাসী, ইতালিয়ান, চীনা, গ্রীক, অর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, তুর্কি, কুর্দ, চেকোশ্লোভাক, জার্মান অষ্ট্রিয়ান পোলিশ যোদ্ধা এসে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল। রুষদেশের সঙ্গে নামমাত্র "মৈত্রী" সত্ত্বেও ইংরেজ, ফরাসী, জাপানী, ইতালিয়ান আর আমেরিকান সরকার অসংকোচে এই অন্যায় যুদ্ধ চালাচ্ছিল। দেনিকিন, কলচাক, য়ুদেনিচ, রাংগেল প্রভৃতি বিদ্রোহী সেনানায়করা তাঁদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য পাচ্ছিল। জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রীরা যেমন চীনে তথাকথিত "স্বতন্ত্র" শাসনব্যবস্থা খাড়া করেছে প্রাক্তন রুষ সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশে সোভিয়েট-শত্রুরাও তাই করেছিল। অন্যান্য শক্তির সাহায্য নিয়ে ইংরেজ নৌ-বাহিনী বহুকাল ধরে অবরোধ চালিয়ে খাদ্য, পরিচ্ছদ ও অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ করেছিল। সোভিয়েটের চূড়ান্ত বিপত্তিই ঘটেছিল; ভবিষ্যৎ অনেকের চোখেই একেবারে ঘনান্ধকার ঠেকেছিল। সে বিপদের কাছে আজকের বিপদ অতি তুচ্ছ। রুষদেশে তখন অন্ন-বস্ত্রের অভাব, যোদ্ধার অভাব, সেনাপতির অভাব, অস্ত্রের অভাব। সেই ঘোর দুর্দিনে লেনিনের নেতৃত্ব ও তাঁর সহযোগীদের অটল দৃঢ়তা সোভিয়েটকে রক্ষা করেছিল। জনসাধারণ দেখেছিল যে জমিদার পুঁজিদাররা বিদেশীদের দলে ভিড়ে দেশকে ছারখার করতে সংকোচ বোধ করেনি; বলশেভিকরাই যে যথার্থ দেশের মঙ্গল আনবে, সে বিশ্বাস তাদের তখন থেকেই বদ্ধমূল হতে থাকে। আর পৃথিবীর নানা দেশের শ্রমিক-আন্দোলন নেতৃত্বের পঙ্গুতা সত্ত্বেও ক্রমে সোভিয়েট বিপ্লবের তাৎপর্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠায় ধনিক সরকারগুলি আর নিশ্চিন্তমনে আক্রমণ চালাতে পারেনি। সোভিয়েট

বিপ্লব যে দুর্গতি অতিক্রম ক'রে এসেছে, তার কথা স্মরণ করলে আজ নিরুৎসাহ হয়ে পড়া যে মতিভ্রম, তা বোঝা যাবে।

সেদিন পর্যন্ত যেমন দেখা গিয়েছে যে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ভুলে সোভিয়েটকে বিপন্ন করার জন্য ইংরেজ, জার্মান, ইতালিয়ান সরকার একজোট হচ্ছে, তেমনি রুষ বিপ্লবের পর ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, নিজেদের মধ্যে লড়াই চলতে থাকলেও সোভিয়েটকে বিধ্বস্ত করার জন্য সদলবলে চেষ্টা করেছিল। জারের সাম্রাজ্যের পশ্চিমে যে সমস্ত প্রদেশ ছিল, জার্মানী সেগুলো দখলের ব্যবস্থা করেছিল। জার্মান পুঁজিদারদের সাহায্যে এস্‌থোনিয়া ও লাটভিয়াতে বিপ্লব দমন করা হয়েছিল। ফিনলাণ্ডে গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়ার ফলে সে দেশের পুঁজিদাররা জার্মান সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে। বিপ্লবীদের হত্যা ক'রে বা জেলে পুরে সেখানে এক নূতন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; জার্মান সেনাপতি মানেরহাইম ছিলেন তার কর্তা। জার্মানীর রাজবংশের কাউকে ফিনলাণ্ডের রাজপদে বসাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। আজ যে য়ুক্রেন প্রদেশ পদানত করবার লোভে ও আশায় হিটলার সোভিয়েট আক্রমণ করেছে, সেই জনবহুল প্রদেশ দখল করার চেষ্টা জার্মানী তখনই করেছিল। সেখানকার পালামেণ্ট "রাডা"কে উঠিয়ে দিয়ে জার্মান সরকার স্কোরোপাড্‌স্কি ব'লে একজনকে নেতা খাড়া করেছিল; জার্মান সেনাপতি ফন আইথ্‌হর্ণ ছিলেন আসল শাসক। য়ুক্রেন থেকে জার্মান সৈন্য এগিয়ে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত গিয়েছিল, অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে পড়েছিল যে কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েটের যে নৌবাহিনী ছিল, তা জার্মানদের কবলে পড়বে এই ভয়ে তাকে ডুবিয়ে দিতে হয়েছিল। জার্মানীর বন্ধু, তুর্কীর সুলতান দক্ষিণ থেকে সোভিয়েট রাজ্য আক্রমণ করে। জার্মানীর উদ্দেশ্য ছিল বল্টিক আর কৃষ্ণসাগরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা, য়ুক্রেনের শস্য আর রুমেনিয়ার পেট্রল হাতে পাওয়া, আর কৃষ্ণসাগরে

একটা 'সাবমেরিনের' আড্ডা খুলে মেসোপোটেমিয়া বা পারস্য থেকে ইংরেজ আক্রমণ বন্ধের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া অবশ্য জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা জান্‌ত যে, সোভিয়েট শক্তিকে চূর্ণ করতে পারলে তারা খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে চিরাচরিত শোষণকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারবে।

জার্মানী যখন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এইভাবে এগিয়ে চলেছে, তখন জার্মানীর শত্রুদের পক্ষে সোভিয়েটকে সাহায্য করাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত মনে হবে। কিন্তু নিজেরা ঝগড়া করলেও পুঁজিদারের দল জানে যে, গণশক্তিই তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই দেখি, ইংরেজ ফরাসীর দলও সোভিয়েট দলনে লেগে গেল। প্রথমে অবশ্য তারা সাধারণ লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য বলেছিল যে, বলশেভিকরা জার্মানদের চর; তারা জান্‌ত যে বলশেভিকবিরোধী মিলিউকফ, যিনি অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রুষ দেশের পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন, তিনি সরাসরি জার্মানীকে সাহায্য করছিলেন, সোভিয়েটরাজ্য ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। আসল ব্যাপার ছিল এই যে বলশেভিকদের মনে করা হ'ত "সভ্যতার শত্রু"; সভ্যতার অর্থ অবশ্য জনসাধারণকে অধিকারচ্যুত ক'রে রাখা আর পুঁজিদারদের অভিসন্ধিপূরণের ব্যবস্থা করা। উইনষ্টন্ চার্চিল—লেখায় এবং বক্তৃতায় বলেছিলেন—"হুন"দের চেয়েও বলশেভিকরাই 'সভ্যতাকে' অধিক বিপন্ন করছে। (জার্মানদের তখন গালাগাল দিয়ে "হুন" বলা হত।)

বলশেভিকদের বিধ্বস্ত করার জন্য জারের সাম্রাজ্যের অধিকাংশই বিদেশীরা অধিকার ক'রে বসেছিল। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা যেসব চেকো-স্লোভাক বন্দী রুষদেশে ছিল তাদের এক বিদ্রোহ লাগিয়ে দিয়ে য়ুরাল পর্বতের কাছে ভাল্‌গা নদীর তীরে এক তথাকথিত "স্বাধীন" সরকার স্থাপন করেছিল। ইংরেজ সৈন্য আমেরিকানদের নিয়ে উত্তরে আক্রমণ আরম্ভ ক'রে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আসছিল। পূর্বে ভ্লাডিভষ্টক থেকে জাপানী

সৈন্তরা অগ্রসর হয়ে চেকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ; ঐ দিক থেকে আর এক আমেরিকান বাহিনী আক্রমণ করেছিল। আর এক দল ইংরাজ সৈন্য মেসো-পোটেমিয়া থেকে রওনা হয়ে পারস্যের মধ্য দিয়ে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণকুল অধিকার করেছিল ঃ তুর্কমেনিস্থানে ভারতীয় সিপাহীদেরও সোভি-য়েট আক্রমণে লাগানো হয়েছিল। বাকুতে সোভিয়েট কমিশারদের হত্যায় ইংরেজদের হাত ছিল। উত্তর ককেশাসে বিদ্রোহী সেনাপতি ক্রাসনভ্কে জার্মান সরকার খোলাখুলি সাহায্য করছিল।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন জার্মান কাইজারের পতন হওয়ার ফলে জার্মানীর সোভিয়েট আক্রমণ আর চলল না। কিন্তু ইংরেজ-ফরাসীরা ব্যবস্থা করল যে, যতদিন-না জার্মান বাহিনীগুলির জায়গায় নূতন সৈন্য পাঠানো হচ্ছে, ততদিন তারা সোভিয়েটরাজ্য ছেড়ে আসতে পারবে না।

সোভিয়েট শাসনের বয়স তখন এক বৎসর মাত্র। কিন্তু তার আশ্চর্য্য প্রতিরোধ দেখে পৃথিবীর পুঁজিদাররা ভাবতে লাগল, "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী !" তাই আবার যুদ্ধক্লান্ত বাহিনীকে আহ্বান করা হল। ফরাসী সৈন্য কৃষ্ণসাগরের উত্তরে নেমে সোভিয়েট শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করতে লাগল। সোভিয়েটের দারুণ শত্রু বিদ্রোহী সেনাপতি দেনিকিনের অনুচরদের জন্য ফরাসী জাহাজে অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্য-দ্রব্যাদি আনা হল। স্পেনে ফ্রাঙ্কো যেমন একবার হুমকি দিয়েছিল যে, একদিন সে মাদ্রিদ সহরে প্রবেশ করবে, সহরবাসীরা সে জন্য তৈরী হোক, তেমনি সোভিয়েটদ্রোহী কল্চাক্ ঘোষণা করেছিল যে, ১৯১৯ সালের ২৬শে মে তারিখে সে মস্কো অধিকার করবে। ফ্রাঙ্কো যেমন ফ্যাসিস্টদের আর তাদের বন্ধুদের সাহায্য পেয়েছিল, কল্চাক তেমনি ফ্রান্স, বৃটেন, ইতালী, আমেরিকা, জাপানের সাহায্য পেয়েছিল। কিন্তু ফ্রাঙ্কো যেমন মাদ্রিদে নির্দিষ্ট তারিখে ঢুকতে পারেনি, তেমনি

কল্‌চাকেরও মনস্কামনা পূর্ণ হল না। সোভিয়েটের 'লালফৌজ' তখন তৈরী, পুঁজিদারদের অহংকার চূর্ণ হবার ব্যবস্থা হচ্ছিল।

এর পর কিছুদিন বিদেশী আক্রমণের প্রচণ্ডতা কমতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯২০ সালে আবার পিলসুড্‌স্কির (যিনি এককালে 'সোসালিস্ট' ব'লে পরিচিত ছিলেন!) নেতৃত্বে পোলাণ্ডের সৈন্য য়ুক্রেন আক্রমণ করে। ঠিক সেই সময় ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ মন্ত্রীদের কথামতো হটাৎ পিলসুড্‌স্কিকে পোলিশ প্রজাতন্ত্রের প্রথম বর্ষ পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে এক অভিনন্দনসূচক তার পাঠান। পোলাণ্ডের প্রজাতন্ত্রকে এর পর আর কখনও এরকম অভিনন্দন জানানো হয়নি। সুতরাং ঐ তার-যে সোভিয়েট আক্রমণে ইংরেজ পুঁজিদারদের উল্লাসের প্রতীক, সে সম্বন্ধে সম্বন্ধে নাই। পিলসুড্‌স্কির দল য়ুক্রেনের রাজধানী কীয়েভ শহর একবার অধিকার করেছিল। কিন্তু বুদিয়েনির নেতৃত্বে লাল ঘোড়সওয়ার দল তাদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছিল এবং পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসঅ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। আবার দক্ষিণ থেকে বিদ্রোহী সেনাপতি রাংগেল ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে লালফৌজের কাছে একেবারে পরাজিত হল।

১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে প্রায় সকল বিদেশী আক্রমণকারীকে ফিরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু জাপান ১৯২২ সালের শেষ পর্যন্ত ভ্লাডিভস্টক বন্দর ছেড়ে যায়নি; ১৯২৪ সালে তারা উত্তর সাখালিন ছেড়ে যায়, সোভিয়েট রাজ্যে আর একটিও বিদেশী যোদ্ধা থাকে না।

এই দারুণ বিপত্তি থেকে সগর্বে উদ্ধার পাওয়া হচ্ছে সোভিয়েট শাসনের প্রতি জনসাধারণের আসক্তির শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ঐ কয়েক বৎসর সাধারণ লোককে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল; সে কষ্টের তুলনায় মহাযুদ্ধের সময় মধ্য ইয়োরোপের কষ্ট নগণ্য বলা চলে। কিন্তু জনসাধারণ কোথাও বিদ্রোহী সেনাপতিদের সমর্থন করেনি, কোথাও সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহের বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখায়নি। তারা বুঝেছিল যে, যারা সোভিয়েটের শত্রু, তারা মুখে দেশপ্রেম সম্বন্ধে অনেক রকম বুলি আওড়ায় বটে, কিন্তু আসলে তাদের অনুরাগ দেশের উপর নয়, টাকার উপর। সোভিয়েট শাসনে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুখ সুবিধার জন্য জনসাধারণকে বলি দেওয়ার অপব্যবস্থা বন্ধ হচ্ছে, এই আশঙ্কাতেই তারা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিল। ফরাসী বড়লোকেরা যেমন ১৭৯২ সালে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিদেশীর সাহায্য নিয়ে স্বদেশ আক্রমণ করতে সংকোচ বোধ করেনি, তেমনি রুষ পুঁজিদার জমিদারের দল স্বার্থ বিপন্ন দেখে বিদেশীকে ডেকে দেশকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। বলশেভিকরাই-যে দেশের যথার্থ মঙ্গল চায়, এ ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল, তাই বিষম দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও তারা সোভিয়েট রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। পঞ্চাশ লক্ষ যোদ্ধা মিলে যে লালফৌজের সৃষ্টি হয়েছিল, তার তুলনা পৃথিবীতে নেই।

কিন্তু দেশের ও বিদেশের অর্থবানদের চক্রান্ত বিফল হওয়ার আরও কারণ ছিল। নেতৃত্বের পঙ্গুতা সত্ত্বেও নানা দেশের শ্রমিকরা ক্রমে বুঝেছিল যে, সোভিয়েট শাসনকে রক্ষা করা শুধু রুষদের নয়, তাদেরও কর্তব্য। ইংলণ্ডের রেলওয়ে, ট্রান্সপোর্ট ওয়াকর্স আর খনিশ্রমিকদের ইউনিয়ন একত্র মিলে ঘোষণা করেছিল যে সোভিয়েট রাজ্য থেকে ইংরেজ সৈন্য সরিয়ে না আনলে তারা ধর্মঘট করবে। ১৯২০ সালে পিলসুড্‌স্কির জন্য ইংরেজ জাহাজে "জলিজর্জে" অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হচ্ছিল; লণ্ডনের ডক-মজুরেরা সে জাহাজ মাল ওঠাতে অস্বীকার করে। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডের সবত্র Council of Action স্থাপন ক'রে সরকারের সোভিয়েট-বিরোধিতার বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন চলতে থাকে। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ স্বীকার করেছিলেন যে, গুপ্তচরদের বাবদ খরচ বাদে দশ কোটি পাউণ্ড দিয়ে সোভিয়েটদ্রোহী সেনাপতিদের সাহায্য করা হয়েছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড

থেকে সোভিয়েট সংবাদপত্র "প্রাভ্দার" এক জাল সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশ ক'রে রুষদেশে বিলি করা হয়েছিল, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রচার চলেছিল। কিন্তু ইংরেজ শ্রামকদের মনোভাব দেখে লয়েড জর্জের মন্ত্রিসভাকে মতলব বদলাতে হল, ইংরেজ সৈন্য সরিয়ে আনা হল।

কৃষ্ণসাগরে ফরাসী নৌ-বাহিনীতে ঠিক ঐ কারণে বিদ্রোহ বাধে; তার নেতা ছিলেন বিখ্যাত কমুনিস্ট আঁদ্রে মার্তি। আরো কয়েক যায়গায় ছোটখাট বিদ্রোহে সাধারণ সৈনিক ও নাবিকের অসন্তোষ প্রকাশ পায়। ১৯১৯ সালের ২১শে জুলাই তারিখে, পুঁজিদারী সরকারগুলির সোভিয়েট-বিরোধের প্রতিবাদ করার জন্য এক আন্তর্জাতিক ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়; সব দেশে সে ধর্মঘট সফল না হলেও তার গুরুত্ব বড় কম নয়।

সোভিয়েট জনসাধারণের অটল তেজস্বিতা আর দুনিয়ার শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে পুঁজিদারদের মতলব হাঁসিল হল না। গণশক্তির বিরুদ্ধে যে বিরাট অভিযান তখন চলেছিল তার সম্পূর্ণ পরাজয় গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এক অতি গৌরবময় অধ্যায়। সে কথা স্মরণ করলে আজ আমরা নূতন প্রেরণা পাবো। আন্তর্জাতিক গণ-আন্দোলন ঐক্যসূত্রে গ্রথিত থাকলে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা তাকে পরাভূত করতে পারে।

"আনন্দবাজার পত্রিকার" সৌজন্যে পুনর্মুদ্রিত।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে ধর্মের স্থান

অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে, সোভিয়েট শাসনে ধর্মের বিষম বিড়ম্বনা ঘটেছে। আমরা ধর্ম বল্‌তে যা বুঝি তার এক প্রকার বিলোপ সাধন করা হয়েছে। ধর্মানুষ্ঠান যাঁরা করেন, তাঁদের উপর দারুণ অত্যাচার চলেছে। মোটের উপর ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা সোভিয়েট রাষ্ট্রে একেবারে নেই।

আসলে কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। সেখানে অবশ্য ধর্মপ্রচারের পক্ষে আবহাওয়া অনুকূল নয়; তেমনই অন্যান্য দেশেও ধর্মবিরোধী আন্দোলন চালানো সহজ নয়। কিন্তু সেখানে খৃষ্টান ইহুদী, মুসলমান ও বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারেরও কোনো প্রমাণ নেই। ধর্মবিশ্বাসকে কখনও বেআইনী ঘোষণা করা হয়নি, ব্যক্তিগতভাবে ধর্মানুষ্ঠানেও কোনো বাধা নেই। যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী তাঁদের কম্যুনিস্ট দলে প্রবেশাধিকার নেই; কিন্তু অন্যান্য কাজ পেতে বাধাও নেই। গির্জা, মসজিদ ইত্যাদি এখনও খোলা থাকে, উপাসনায় যার খুসী যোগ দিতে পারে। অবশ্য পাদরী, মোল্লা প্রভৃতির ভরণপোষণের ভার সরকার নেয় না; যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরাই চাঁদা তুলে সে ব্যবস্থা করেন।

সিডনি ও বীট্রীস্ ওয়েবের প্রামাণ্য গ্রন্থে প্রকাশ যে, ১৯৩৪ সালে মস্কো শহরে চল্লিশেরও বেশি গির্জায় উপাসনা চল্‌ত, কীফ্ শহরে ছিল প্রায় কুড়িটা গির্জা। লেনিনগ্রাড আর মস্কোতে রোম্যান ক্যাথলিকদেরও গির্জা ছিল। কাজানের মতো অনেক জায়গায় মস্‌জিদ ছিল, যথারীতি উপাসনাও চলত। কোনো কোনো জায়গায় বৌদ্ধ মন্দির আর ইহুদীদের 'সিনগাগ্' দেখা যেত। গ্রাম অঞ্চলে শতকরা প্রায় ৭০টা গির্জায় উপাসনার ব্যবস্থা ছিল।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের সময় ধর্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা সকলের আছে। অবশ্য যারা আধুনিক বিপ্লবী আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে, তারা ধর্মকর্মের ধার ধারে না। কিন্তু প্রাচীনপন্থী যারা, তাদের উপর অত্যাচারও নেই।

রুষদেশে গ্রীক্ অর্থোডক্স চার্চ ছিল প্রবলপ্রতাপ। বিপ্লবের ফলে অবশ্য চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু এখনও রাস্তায় ঘাটে পাদরীর পোষাক-পরা মূর্তি-যে দেখা যায় না, তা নয়। একজন পাদরীর বৈজ্ঞানিকখ্যাতি বেশি ব'লে তিনি ধর্মযাজক হলেও সরকারী বিজ্ঞানাগারে কাজ করেন, এমনকি পাদরীর পোষাকেই তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হয়।

পাঁচ বছর আগে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে তার ফলে গ্রীক্ চার্চের প্রায় পঞ্চাশ হাজার এবং অনেক ক্যাথলিক ও অন্যান্য খৃষ্টান পাদরী, মুসলমান মোল্লা আর বৌদ্ধ ভিক্ষু নির্বাচনে ভোট দিতে পেরেছে। ১৯৩৬-এর পূর্বে এদের ভোট ছিল না। কিন্তু সোভিয়েট শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব'লে যাদের সোভিয়েটবিরোধী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাদেরও ভোট দেওয়া হয়েছে। ধর্মানুষ্ঠান-যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে বন্ধ করা হয়নি এত পুরোহিতের অস্তিত্ব তার প্রমাণ। ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা যে সম্প্রতি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে, তাও নিঃসন্দেহ।

অবশ্য ধর্মবিরোধী আন্দোলন সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রথম থেকেই চলেছে। কম্যুনিষ্টরা নাস্তিক, ধর্মবিশ্বাসের সামাজিক বিশ্লেষণ ক'রে তারা দেখেছে যে গরীবকে সান্ত্বনা দিয়ে, স্বর্গ বা পুনর্জন্মের কথা ব'লে ইহকালের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে রাখবার পক্ষে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ধর্মপ্রচার। রুষদেশে বিশেষত দেখা গেছে যে ধর্মের নামে অধর্মেরই প্রাবল্য ঘটেছে, জারের নৃশংস শাসনে খৃষ্টান পুরোহিতরা ঐকান্তিক সহযোগিতা করেছে, রুষ ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল অশিক্ষা কুসংস্কার ও দুর্নীতির কেন্দ্র, রাস্পুটিনের মতো লম্পট ছিল ধর্মের প্রতীক আর রুষ সাম্রাজ্যের কর্ণধার। বাস্তবিকই রুষ-দেশে ধর্মের নামে যা চলত তা কারও সমর্থন পাবার যোগ্য ছিল না।

গরীবকে দাবিয়ে রেখে বড়লোকদের শাসন কায়েম করার কাজে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি যে সাহায্য ক'রে এসেছে, তা নানাভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রে

প্রচার করা হয়েছে। সভাসমিতি ক'রে, পুস্তিকা বিতরণ ক'রে, ধর্মবিরোধী 'মিউজিয়ম' স্থাপনা ক'রে, এই প্রচার চলেছে। ধর্মের নামে কত অপলাপ যে চলেছে, তার প্রমাণ এইভাবে সাধারণকে জানানো হয়েছে।

সাধারণত ধর্মযাজকেরা সোভিয়েট শাসনের পরম শত্রু ব'লে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯৩৬-এর আগে তাই তারা ভোট দেবার অধিকার পায়নি। আজ সোভিয়েট শাসন এত দৃঢ়মূল হয়েছে যে, ধর্মযাজকদেরও ভোট দেওয়া হয়েছে।

ধর্মের নামে রাষ্ট্রের বিরোধিতা এত বেশি হয়ে এসেছে যে এখনও ধর্মপ্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা সোভিয়েট শাসনে নেই। গির্জায়, মসজিদে, সিনাগগে, মন্দিরে ধর্মপ্রচার হোক, উপাসনা হোক—কিন্তু বাইরে ধর্মান্দোলন করতে দেওয়া হয় না। এ ছাড়া ধর্মব্যাপারে আর কোনো প্রতিবন্ধক সোভিয়েট রাষ্ট্রে নেই।

নূতন শাসনতন্ত্রের ১২৪ ধারায় বলা হয়েছে:—"বিবেকের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্র ও চার্চের সম্বন্ধ ছিন্ন করা হয়েছে; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মযাজকদের প্রভাব থেকে মুক্ত করা হয়েছে। প্রতি নাগরিকেরই ধর্মানুষ্ঠান ও উপাসনার বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, ধর্মবিরোধী প্রচারকার্যেও পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।"

ব্যক্তিগত ধর্মাচরণে কোনো বাধা সোভিয়েট দেয় না, কিন্তু ধর্ম-প্রচারের নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার স্থান সেখানে নেই, ধর্মের নামে দাঙ্গাহাঙ্গামার বিলাসিতা সেখানে চলে না।

সোভিয়েট রাষ্ট্র

সোভিয়েট শাসনবিধির প্রথম ধারাতেই পরিষ্কার বলা হয়েছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে মজদুর আর কিষাণদের সাম্যবাদী রাষ্ট্র।

এ কথা শুনে অনেকে হয়তো আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। রাষ্ট্র কি কখনও শ্রেণীবিশেষের হতে পারে! রাষ্ট্র-যে সার্বভৌম, সর্বব্যাপী। সোভিয়েট জনসাধারণ কি সে কথা স্বীকার করে না?

এ আপত্তির উত্তর খুবই স্পষ্ট। রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে গভীর বুজরুকি বহুদিন থেকে চলে এসেছে, সাম্যবাদীরা তা স্বীকার করে না।

আমাদের শিক্ষাদীক্ষার যাঁরা অভিভাবক, তাঁরা শুধু বুঝিয়ে আসছেন যে, রাষ্ট্র শ্রেণীভেদ ও স্বার্থভেদকে অতিক্রম ক'রে সকলকেই ব্যক্তিস্বস্ফুরণের সুযোগ দেয়—ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বাধীনতা একমাত্র রাষ্ট্রজীবনেই সম্ভব।

দার্শনিকশিরোমণি হেগেল রাষ্ট্রকে প্রায় এক অলৌকিক স্তরে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অনুসরণ ক'রে ভাববাদীরা (Idealists) ব'লে থাকেন যে সমাজের আইন মেনে চলা আর নিজের বিবেককে সন্তুষ্ট করার মধ্যে সামঞ্জস্য কেবল রাষ্ট্রই আনতে পারে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকাই মনুষ্যত্ববিকাশের চরম লক্ষণ।

এই সব গালভরা কথা শুনতে ভালই লাগে। রাষ্ট্রের বাস্তব ইতিহাস আলোচনা না ক'রে তার কাল্পনিক রূপচিন্তার বিলাস উপভোগ করাও বেশ সহজ। রাষ্ট্রতাত্ত্বিকরা যখনই ধরা-ছোঁওয়া যায় এমন কথা বলতে গেছেন, তখনই তাঁদের মুখোস খুলে গেছে। হেগেল বলেছিলেন যে তাঁর সময়ের প্রাশিয়াতেই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে সেখানে হেগেলের মতো বহুমানভাজন মহামহোপাধ্যায়দের যজন-যাজন অধ্যয়ন-

অধ্যাপনার কোনো ব্যাঘাত না ঘটলেও জনসাধারণের স্বাধীনতা ব'লে কোনো বস্তুই ছিল না। রাষ্ট্রের দাপটে গরীব জার্মানরা মুখ বুজে মালিকদের শাসন মেনে নিতে বাধ্য ছিল।

সত্যিই যদি রাষ্ট্র একটা চমৎকার ব্যাপার হয়ে থাকে তো এখনও অত্যাচার, অবিচার, যুদ্ধবিগ্রহ, শোষণলাঞ্ছনের অবধি নাই কেন? এতদিন নানা দেশের রাষ্ট্র কি কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুখ সুবিধার ব্যবস্থাই ক'রেনি? তাদের ক্ষমতা কায়েম করার জন্যই কি রাষ্ট্রের অলঙ্ঘ্য শুচিতা সম্বন্ধে এত প্রচার চলে আসেনি?

রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনা না করলে এ প্রশ্নের জবাব মিলবে না। মার্ক্‌স্, এঙ্গেল্‌স, লেনিন প্রভৃতি সে ইতিহাস আলোচনা ক'রে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থার বনিয়াদ।

ইতিহাস বলে যে, এমন একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। শ্রেণীবিভাগ যখন সমাজে প্রথম দেখা দিল, শোষক ও শোষিতের কাহিনী যখন সুরু হল, তখনই রাষ্ট্রের আবির্ভাব। রাষ্ট্র সনাতন নয়; সমাজপতিরা যখন জেঁকে বসল, তখন তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার হাতিয়ার হল রাষ্ট্রব্যবস্থা।

আদিম যুগে একজন মানুষ যা উৎপাদন করতে পারত, তাতে কোনক্রমে তার নিজের খাওয়া-পরা চল্‌ত, উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছু থা'কত না। তাই এক-জনের খাটুনি ভাঙিয়ে আর একজনের লাভ করা সম্ভব ছিল না ব'লে এক-জনের উপর আর একজনের প্রভুত্ব স্থাপনেরও প্রয়োজন ছিল না। ক্রীতদাস রাখ্‌তে হলে তার খোরাকপোষাকের খরচ মালিককে দিতে হয়; সুতরাং যতদিন উৎপাদনপদ্ধতির কিছু উন্নতি না ঘটল, যতদিন ক্রীতদাসের পরিশ্রমের ফলে তার ভরণ-পোষণের খরচ বাদে কিছু উপরি লাভ মালিকের পকেটে না এল, ততদিন ক্রীতদাস রেখে মালিকের কোনো সুবিধা ছিল না,

দাসপ্রথাও সমাজে চলিত হয়নি। সেই আদিম অবস্থায় রাষ্ট্র ব'লে কোনো কিছু থাকার দরকার ছিল না। সমাজ চল্‌ত অনেকটা অভ্যাসের বশে আর সম্মানী ব্যক্তিদের প্রভাবে। রাষ্ট্রের যে প্রধান লক্ষণ—দণ্ড দেবার অধিকার, জুলুম, জবরদস্তির অধিকার—তার তখন প্রয়োজন ছিল না।

তারপর থেকে সমাজে শাসন-নিপুণ এক সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে ; সাধারণ লোককে হুকুম তামিল করার অভ্যাস শেখানো আর সমাজপতিদের, ধনপতিদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখাই তাদের কর্তব্য হয়েছে। দাসপ্রথা, ভূমিদাস-প্রথা, জায়গীরদারী, জমিদারী, পুঁজিদারী—সকল ব্যবস্থাতেই অল্প কয়েক জনের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা চলেছে। প্রচার করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র-দ্রোহিতার চেয়ে দুষ্কর্ম আর নেই, চরম দণ্ড তার শাস্তি। সমাজব্যবস্থাকে অটুট রাখার নামে সমাজপতিদের জবরদস্তি আর জনসাধারণের বিড়ম্বনাকে সমর্থন করা হয়েছে। রাষ্ট্রের 'স্বরূপ' সম্বন্ধে কাল্পনিক ভাববিলাস সুশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগ শ্রেণীনির্বিশেষে সকল পৌরজনের পরম কর্তব্য ব'লে প্রচারিত হয়েছে। রাষ্ট্রের নামে প্রভু'শ্রেণীর একাধিপত্যে জনসাধারণ যে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, সে কথা ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা চলেছে।

বর্তমান যুগ হচ্ছে ধনতন্ত্রের যুগ ; এ যুগের শ্রেষ্ঠ বল হচ্ছে অর্থবল। যে যুদ্ধ রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বরূপকে প্রকট ক'রে দেয়, সে যুদ্ধের জনক হচ্ছে ধনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধনিকশ্রেণীর স্বাভাবিক সাম্রাজ্যলিপ্সা। অর্থবানরা আজকের সমাজপতি ; তাই রাষ্ট্রব্যবস্থা সংখ্যাল্প অর্থবানদের কল্যাণকল্পে রয়েছে। লেনিন ঠিকই ব'লছিলেন যে 'আসলে রাষ্ট্র হ'চ্ছে ধনিকশ্রেণীর কার্যনির্বাহক সভা'।

একটী শ্রেণী আর-একটী শ্রেণীকে চেপে রাখে যে অস্ত্র দিয়ে, সেই অস্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র। একথা শুধু রাজতন্ত্র নয়—প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র সম্বন্ধেও খাটে। সাধারণের ভোট দেবার অধিকার সম্বন্ধে এঙ্গেলস্‌ বলেছিলেন যে "তা এইমাত্র

বোঝায় যে শ্রমিকশ্রেণীর অপরিণত অবস্থার অবসান হয়েছে।" কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধাপ্পাবাজি হচ্ছে এই যে ভোটের ঘুষ দিয়ে সাধারণ লোককে ভুলিয়ে রাখা চলে, বড়লোকদের সর্দারী বজায় থাকে, টাকার অভাবে গরীবের পক্ষে প্রচার চলে না, নির্বাচনে জিত শক্ত হয়ে পড়ে, আর রাষ্ট্রশক্তি হাতে না এলে গরীবের গরীবানা ঘোচানো সম্ভব হয় না। ভোট থাক্‌লেই যদি গরীবের সব মুস্কিল আসান হয়ে যেত, তাহলে যাত্রার দলে যে রাজা সাজে তারও দুঃখ ঘুচত।

কয়েকজন "সাম্যবাদী" পণ্ডিত বলতেন, আর বিলাতের লেবার পার্টির সুবিধাবাদী নেতারা আজও প্রাণপণে আশা করেন যে ধীরে-সুস্থে ঘষে-মেজে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সাম্যবাদে পরিণত করা চলবে, আর পার্লামেণ্টের পাকা রাস্তা দিয়ে অক্লেশে সাম্যবাদের রাজ্যে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু বিপ্লবকে দূরে পরিহার ক'রে রাষ্ট্রের পুরাণো ঠাট্‌ বজায় রেখেছিল ব'লে জার্মানীর পার্লামেণ্টমুগ্ধ সোশালিষ্টদের শাস্তি হল হিটলারের করাল কবলে পড়া। পার্লামেণ্টের সদিচ্ছা যতই থাকুক, গরীব আর বড়লোকের শ্রেণীস্বার্থে প্রভেদ রয়ে গেলে সাম্যবাদের কাছাকাছিও পৌঁছানো যাবে না। জমিদারের দাপট যতই হোক্‌, সত্যই বাঘ আর ছাগলকে একঘাটে জল খাওয়ানো সম্ভব নয়।

অধ্যাপক ল্যাস্‌কি এ বিষয়ের আলোচনা ক'রে দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রক্ষমতা শোষকদের হাত থেকে শোষিতদের হাতে যাওয়া যে উচিত তা তিনি বেশ বোঝেন। আইনকানুন বাঁচিয়ে, বিনা বিপ্লবে উদ্দেশ্য-যে সিদ্ধ হবে, সে ভরসা তিনি ইতিহাস থেকে পান না; কিন্তু বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর মারাত্মক ভীতি রয়ে গেল। দোটানা থেকে উদ্ধার পেতে হলে মার্ক্‌সবাদের শরণ নিতে হয়। মুস্কিলই বটে!

মার্ক্‌স একবার বলেছিলেন, "ধনতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় যাওয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের একটা কাল-

ব্যবধান আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের একটা বিশিষ্ট পর্যায় আছে। এ সময় রাষ্ট্র প্রলেটেরিয়েটের বৈপ্লবিক একাধিপত্য ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না।"

গণতন্ত্রের মুখোস পরা থাকলেও বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্ব নষ্ট করা সাম্যবাদীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। ভালোমানুষের মতো যখন তারা নির্বিবাদে শ্রমিক-শাসন মেনে নেবে না, তখন তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য এই বিপ্লবী একাধিপত্য প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণী অ্যানার্কিস্টদের মতো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উড়িয়ে দিয়েই খুসী হতে পারে না। রাষ্ট্র চিরকালই শ্রেণীস্বার্থ কায়েম করার অস্ত্র ; তাই সর্বহারাদের স্বার্থরক্ষা আর বিরোধী-দের শক্তি-ধ্বংসের জন্যই রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে। শ্রেণীহীন সমাজ তো আর একদিনে তৈরী হয় না। সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন সমাজ যখন আসবে তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পাবে ; চরকা আর কুঠারের মতো রাষ্ট্রকে যাদুঘরে পাঠানো চলবে। কিন্তু যতদিন শ্রেণীহীন সমাজ না আসছে ততদিন রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করতে হবে মজদুর কিষাণের হাতিয়ার হিসাবে, ততদিন চলবে শ্রমিক-একাধিপত্য।

সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই একাধিপত্যেরই সাক্ষাৎ মিলবে। সারা দুনিয়া যাদের দুষমণ, তাদের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্যই এর দরকার ছিল। যাদের শত্রু ঘরে বাইরে সর্বত্র, তাদের পক্ষে এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

কিন্তু জনসাধারণের একাধিপত্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, সমাজের শতকরা ৯৯ জন যা চায়, তাই বাহাল হবে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কর্তৃত্ব আর বরদাস্ত হবে না। তাই বলা যায় যে এ ব্যবস্থা হচ্ছে যথার্থ গণতন্ত্রের চূড়ান্ত। বড়-লোকের প্রভুত্ব চলুক, গরীবের উপর জুলুম যেমন চিরকাল চলছে তেমনই চলুক, ভোট দেওয়ার অধিকার না হয় সকলকেই দেওয়া হোক্—এই ধাপ্পা-বাজিই বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের নামে প্রচলিত আছে। এর তুলনায় মজুর-কিষাণের

সর্দারী সমাজের পক্ষে হাজার গুণ কল্যাণকর। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সেই কল্যাণ বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯০৫ সালে আইভানোভো-ভস্‌নেজেন্‌স্ক্‌ ব'লে একটা ছোট শহরে কাপড়ের কলওয়ালাদের সঙ্গে মজুরদের পক্ষ থেকে কথাবার্তা চালাবার জন্য প্রথম "সোভিয়েট" (বা পঞ্চায়েৎ) স্থাপিত হয়। যেসব শহরে কারখানা ছিল, ক্রমে সে সব যায়গায় ঐ রকম সোভিয়েট খাড়া করা হয়। আর ঐ বৎসর বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটগুলি মিউনিসিপ্যালিটি দখল ক'রে শহর শাসন চালায়। কিন্তু বিপ্লব সেবার সফল হ'ল না ব'লে সোভিয়েট আন্দোলনও নষ্ট হ'ল।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জারের শাসন যখন ভেঙে আসছিল, তখন আবার ঐ সোভিয়েটকে দেখা গেল। রুষরাজধানী পেট্রোগ্রাডে সমস্ত কারখানার শ্রমিকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সোভিয়েট গঠন করল, শহরে ও গ্রামেও তাই হ'তে লাগল, সৈনিক-নাবিকরাও নিজেদের সোভিয়েট খাড়া করল।

বলশেভিক বিপ্লব জয়যুক্ত হ'ল নভেম্বর মাসে। তখন একদিকে ছিল জনসাধারণের হাতে-গড়া সোভিয়েট, অন্যদিকে চলছিল বিপ্লববিরোধীদের গূঢ় ষড়যন্ত্র। বলশেভিক নেতা লেনিন বুঝলেন যে, সোভিয়েটই হবে নতুন সমাজ গড়বার বিপ্লবী হাতিয়ার। ৭ই নভেম্বর সোভিয়েট রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল; সোভিয়েট-কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হ'ল যে, তার নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি আর তার মনোনীত কমিসাররা দেশের শাসনভার গ্রহণ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে ঐ প্রথম মজুর- কিষাণের দল সমাজ ভেঙে গড়ার শক্তি পেল।

১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে তৃতীয় সোভিয়েট-কংগ্রেস অত্যাচারিত জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে একটা ঘোষণা প্রচার করল। সকলকে জানানো হ'ল, "সমাজ থেকে শ্রেণীভেদ চিরকালের জন্য দূর ক'রে, শোষকদের নির্মমভাবে দমন করে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।"

১০ই জুলাই, ১৯১৮, তারিখে প্রথম সোভিয়েট শাসনবিধি মজদুর-কিষাণদের প্রতিনিধিরা সোভিয়েট-কংগ্রেসে গ্রহণ করল। তখন সোভিয়েটের দারুণ দুঃসময়; চারদিকে গৃহযুদ্ধ চলছিল, বিদেশীরা এসে নবজাত সোভিয়েটকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা করার কাজে লেগেছিল, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে নানা মুনির নানা মত প্রচার হচ্ছিল, "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের" দোহাই দিয়ে সোভিয়েটগু'লকে উৎপাটিত করার অপচেষ্টা চলছিল। কিন্তু বিপ্লবের জোয়ার যখন আসে, জনসাধারণ তখন এগিয়ে চলে বিপুল উল্লাস নিয়ে, বাধাবিপত্তি তখন তৃণের মতো ভেসে যায়। বলশেভিক নেতারাও সিংহবিক্রমে জনসাধারণকে পথের নির্দেশ দিয়েছিল। চার বৎসরের মধ্যে শত্রুর নিপাত হ'ল। ১৯২৪-এ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিধি সম্মিলিত সোভিয়েট-কংগ্রেসে গৃহীত হ'ল।

১৯৩৭ থেকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কানুনে কতগুলো জরুরী অদলবদল হয়েছে। কিন্তু প্রথমে ১৯৩৭-এর আগে কী ব্যবস্থা ছিল, তার খোঁজ নেওয়া যাক।

সাতটী সাম্যবাদী রাষ্ট্র একজোট হয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গড়েছিল—রাশিয়া, হোয়াইট রাশিয়া, য়ুক্রেন, তুর্কমেনিস্থান, উজ্‌বেকিস্থান, তাজাকস্থান

আর আর্মিনিয়া, জর্জিয়া ও আজেরবাইজানের সম্মিলিত রাষ্ট্র। এদের মধ্যে আবার তাতার ও ভল্‌গা জার্মাণদের গণতন্ত্রের মতো কয়েকটী স্বাধীন অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, বিদেশী বাণিজ্য, রাজস্ব, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভাগ পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যাপারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। তা ছাড়া প্রত্যেকেরই যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাবার পূর্ণ অধিকার আছে। প্রত্যেক অঞ্চলে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেবার যে ব্যবস্থা এখন আছে, তার তুলনায় জারের শাসন-যে কত নিকৃষ্ট ছিল বোঝা যায়। বিপ্লবের আগে লেখাপড়া শিখতে পেত সামান্য কয়েকজন, তাদের শিখতে হ'ত রুষ ভাষা, অন্য সব ভাষা অগ্রাহ্য অবস্থায় পড়ে ছিল। রুষ সাম্রাজ্য ছিল একটা বিরাট কয়েদখানা, কত জাতি সেখানে বন্দী হয়ে থাকত! এই কয়েদখানাতে সোভিয়েট-শাসন মুক্তির হাওয়া এনে দিল।

বিপ্লববিরোধীরা যাতে রাষ্ট্রকে বিকল না করতে পারে, সে জন্য প্রথম শাসনবিধিতে কয়েকটী বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। যারা পরশ্রমজীবী তাদের ভোট দেওয়া হয়নি; তেমনি যারা পাদরী বা মঠের লোক, যারা পুরোণো সরকারের কর্ম্মচারী ছিল কিম্বা যাদের মস্তিষ্ক বিকৃত, তারা ভোট পায়নি। এতে লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় আড়াই জন মাত্র ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ভোট দেওয়া ব্যাপারে সোভিয়েট জনসাধারণের উৎসাহ যথেষ্ট। ১৯৩৪ সালের নির্ব্বাচনে ৯ কোটী ১০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ৭ কোটী ৭০ লক্ষ লোক ভোট দিয়েছিল। এই ভোটের ব্যাপার ছাড়া

ট্রেড ইউনিয়ন বা কো-অপারেটিভ বা যৌথ কৃষিসমবায়ের দৈনন্দিন কাজে লেগে থেকে সোভিয়েট জনসাধারণ স্বায়ত্তশাসনের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে, অন্য কোনো দেশে তার তুলনা নেই।

সোভিয়েটভূমিতে প্রত্যেকে আঠারো বৎসর বয়েসে ভোট দিতে পারে, ঐ বয়সে নিজেরা নির্বাচিত হতে পারে। এত কম বয়সে ভোটের অধিকার আর মাত্র তিনটি দেশে আছে—তুর্কী, আর্জেন্টাইন, মেক্সিকো। কিন্তু এ তিন দেশের কোথাও আঠারো বৎসরের মেয়েরা ভোট দিতে পারে না, আর মেক্সিকোর নিয়ম হচ্ছে এই যে, আঠারো বৎসরের ছেলে বিবাহিত না হলে ভোট পাবে না! অত অল্প বয়সে শুধু ভোট দেওয়া নয়, নির্বাচিত হওয়ার অধিকারও দেয় একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন।

বিদেশ থেকে যারা এসে সোভিয়েট কলকারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, তাদেরও ভোট দেওয়া সম্বন্ধে সমান অধিকার। স্ত্রীপুরুষের অধিকারভেদ সোভিয়েট দূর করেছে—শুধু ভোট দিয়ে নয়, মেয়েদের পুরুষের সমান বেতন দিয়ে, শিশুজন্মের পূর্বে ও পরে কিছুকাল তাদের পুরো বেতনে ছুট আর দরকারের সময় প্রসূতিপরিচর্যার ব্যবস্থা করে, ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে কেবল মায়ের আঁচল ধরে না থাকে সেজন্য সরকারী খরচে তাদের খেলাধুলা আর খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে, রান্নাঘরের ভিতর মেয়েরা যাতে কয়েদী না থাকে সেজন্য বহুলোকের একত্র ভোজনালয় সর্বত্র স্থাপন ক'রে। শুধু একটা ভোট পেলেই যে কেল্লা ফতে হয় না, তা তো আমরা খুবই বুঝি। যাদের পকেটে টাকার অভাব নেই, পয়সা বিলিয়ে সভা-শোভাযাত্রা করা যাদের পক্ষে সহজ, খবরের কাগজ যাদের হাতে, তারা যখন গরীবের বন্ধু নয়, তখন শুধু একটা ভোট নিয়ে গরীব করে কি? সোভিয়েট দেশে কেউ তাই শুধু ভোট নিয়ে খুসী হয় না, তারা চায় নিজেরা দেশের শাসন চালাতে, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা

করতে। এর কারণ এই যে সোভিয়েট দেশের মালিক সেখানকার জনসাধারণ, আর অন্য সব দেশের মালিক হচ্ছে বড়লোকের দল।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে ইমারৎ, তার বনিয়াদ হচ্ছে গ্রামে, শহরে, কারখানায়, কেল্লায়, জাহাজে সর্বত্র মজ্‌দুর-কিষাণদের জমায়েৎ। প্রথমে আছে গ্রাম আর ছোট শহরগুলির সোভিয়েট, তারা নির্ব্বাচন করে 'Volst' বা তালুক সোভিয়েট, সেখান থেকে প্রতিনিধি যায় Uyezd বা জেলায় আর Gubernia বা প্রাদেশিক সোভিয়েটে। প্রাদেশিক সোভিয়েট আর মস্কো-লেনিনগ্রাডের মতো বড় বড় শহরের সোভিয়েট মিলে সোভিয়েট-কংগ্রেস নির্বাচন করে ; ইউনিয়নের প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে এই কংগ্রেসই সর্বশক্তিমান। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি ইউনিয়নের কাউন্সিল নির্বাচন করে, আর নিজেদের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন অঞ্চলগুলির সঙ্গে মিলে জাতিসংসদ (Council of Nationalities) গঠন করে। ইউনিয়নেব কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি এই বিরাট সোভিয়েট-কংগ্রেসে মনোনীত হয়। সমিতির সভাপতিমণ্ডলীতে থাকে একুশ জন সভ্য, আর প্রধান বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বলা হয় কমিসার। সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রপতি ব'লে কেউ নেই, তবে কেন্দ্রীয় সমিতির কয়েকজন আর কমিসার-সংসদের একজন সভাপতি আছেন। কালিনিন এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন ব'লে সাধারণত তাঁকেই সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি বলা হয়।

তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নির্বাচন যে-রীতিতে হয়, এখানে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রবিদ্‌রা মনে করেন যে একটা জায়গা থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠালেই ভোট দেওয়া সার্থক হয় না। বাসস্থলের চেয়ে কর্মস্থলের অভাব অভিযোগ লোকে বেশি জানে। আপিস বা কারখানায় সবাই মেলামেশা, গল্পগুজব করে, মতামত স্থির করে। সোভিয়েট দেশে যারই ভোট আছে, সে হয় হাতের নয় মাথার কাজ

করে ; সুতরাং তার পক্ষে আপিস বা কারখানাই হচ্ছে ভোট দেবার সব চেয়ে ভাল যায়গা। তা ছাড়া যারা লড়ছে বা জাহাজ কিম্বা এরোপ্লেনে ঘুরছে, তাদের পক্ষে ইংরেজদের মতো ডাকে ভোট পাঠানোর চেয়ে নিজেদের সোভিয়েট নির্বাচন করা অনেক ভাল। অবশ্য যারা (বিশেষত যেসব মেয়েরা) বাড়ীতে থেকে কাজ করে, তারা সেই অঞ্চল থেকেই স্থানীয় সোভিয়েট নির্বাচন করে।

শ্রমিকশ্রেণীর সর্বময় কর্তৃত্ব বজায় রাখা দরকার ব'লে ১৯৩৭-এর পূর্বে এই নির্বাচনপরম্পরায় প্রথম স্তরের পর পরোক্ষ নির্বাচনেরই ব্যবস্থা ছিল। আবার এই কর্তৃত্ব পাকা করার জন্য নিয়ম করা হয়েছিল যে, শহরে যারা ভোট দেয়, তাদের ভোটের দাম হবে গ্রাম্য ভোটারদের চেয়ে প্রায় তিন গুণ। এর কারণ এই যে, শহরের শ্রমিকদের শ্রেণীচৈতন্য গ্রামের চাষীদের চেয়ে বেশি। বিপ্লববিরোধীরা তখনও অনেক সময় কিষাণদের ভুল বুঝিয়ে দলে টানার চেষ্টা করত। পয়সাওয়ালা চাষীদের প্রভাব গ্রামে তখনও একেবারে নষ্ট করা যায়নি। আর সোভিয়েট শাসন তাদের মনোমত নয় ব'লে গরীবদের ধোকা দেওয়া তাদের মতলব ছিল। তাই শহরের ও গ্রামের শ্রমজীবীদের মধ্যে এই অধিকারভেদ ১৯৩৭ পর্যন্ত রাখতে হয়েছিল।

১৯৩৫ সালে সারা ইউনিয়নের সম্মিলিত সোভিয়েট কংগ্রেসে মলোটভ্ প্রস্তাব করলেন যে, শাসনবিধিতে কী অদলবদল দরকার তা ঠিক করার জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত করা হোক্। একত্রিশ জন সভ্য নিয়ে কমিটি খাড়া করা হ'ল ; স্টালিন হলেন তাদের সভাপতি। কমিটির প্রস্তাবগুলি প্রকাশ হলে সারা ইউনিয়নে তুমুল তর্কবিতর্ক আরম্ভ হ'ল। প্রস্তাবগুলির দেড় কোটী কপি ইউনিয়নের নানা ভাষায় ছাপিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

সভাসমিতিতে, খবরের কাগজে, বেতারে, শহর ও গ্রামের সমস্ত জমায়েতে তার আলোচনা চলল। দু'মাসের মধ্যে মস্কোতে হাজারে হাজারে সমালোচনা আর নতুন প্রস্তাব আসতে লাগল। ১৯৩৩এর ২৫শে নভেম্বর সোভিয়েট কংগ্রেসের অধিবেশন বসল; ইউনিয়নের সমস্ত অঞ্চল থেকে ২,০১৬ জন ডেলিগেট শাসনবিধি সংশোধনের কাজ আরম্ভ করল। দশদিন আলোচনার পর ৫ই ডিসেম্বর তারিখে নতুন শাসনবিধি পাকাপাকি ভাবে গৃহীত হ'ল।

দেশ-শাসন কী ভাবে হওয়া উচিত, তা দেশের লোকই স্থির করবে—শুধু নামে নয়, কাজে করবে—এ ব্যাপার সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোথাও সম্ভব নয়। শুধু ভোট দেবার একটা ভুয়ো অধিকার পেয়ে যারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে মালিকদের জবরদস্তিকে খোসমেজাজে বরদাস্ত করে, তারা কখনও আইনকানুনের অদলবদল নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে সাহস করে না। গণতন্ত্র ব'লে যেসব দেশের সুপারিশ যখন তখন শোনা যায়, তাদের সঙ্গে সোভিয়েট দেশের তফাৎ এইখানে।

* * * *

সোভিয়েট বিপ্লব যতই দুনিয়ার পুঁজিদারদের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলল, যতই সোভিয়েটভূমিতে সাম্যবাদের প্রথম পর্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল, যতই শ্রেণীশত্রুর বিষদন্ত চূর্ণ হয়ে এল, ততই দেশবাসী প্রত্যেককেই সমান রাষ্ট্রিক অধিকার দেওয়া সম্ভব হ'ল। তাই সোভিয়েট গণতন্ত্রের পূর্ণতর বিকাশ আমরা ১৯৩৭ থেকে দেখতে পাই। অন্য বহু দেশে যখন ফ্যাশিজম্‌ বর্বর মূর্তিতে দেখা দিয়েছে, গণতন্ত্র যখন সর্বত্র সংকুচিত করা হচ্ছে, সেই সময় সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় যথার্থ গণতন্ত্রের পূর্ণ সম্প্রসারণ ঘটল।

ইউনিয়নে আগে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল সাতটা; এবার হ'ল এগারো। আর্মিনিয়া, জর্জিয়া, আজেরবাইজান পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ব'লে ঘোষিত হ'ল।

কাজাক আর কিরঘিজরা এত দিন রুষ ফেডারেল সোভিয়েটের-অন্তর্ভুক্ত থেকে নিজেদের শাসন, শিক্ষাদীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের অঞ্চলগুলি এবার নতুন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকার পেল। বিপ্লবের পূর্বে এদের অবস্থা ছিল জঘন্য; জারের শাসনে তাদের বেশ মতলব করেই পশ্চাৎপদ অবস্থায় আট্‌কে রাখা হ'ত। তারা-যে কখনও 'রাজার জাত' রাশিয়ান্‌দের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করবে, তা কেউ তখন কল্পনাও করতে পারত না। আর আজ সোভিয়েট শাসনে জাতি বর্ণ বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য অচল। তাই সোভিয়েট রুষিয়ায় চিরলাঞ্ছিত কত জাতি আজ সগর্বে ও সানন্দে সাম্যবাদ সমাজ গঠনে লেগে গিয়েছে।

শাসনবিধিতে আর একটা প্রধান পরিবর্তন হ'ল এই যে, বিকৃত-মস্তিষ্করা বাদে সকলেই ভোটের অধিকার পেয়েছে। খৃষ্টান পাদরী, মুসলমান মোল্লা, বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রভৃতি আর সে অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়। এমনকি প্রাচীন রাজবংশের জ্ঞাতিত্বও আর ভোট কেড়ে নেবার কারণ মনে করা হয় না। তা ছাড়া পূর্বে যে-ব্যবস্থায় গ্রামের ভোটারদের চেয়ে শহরের ভোটারদের ভোটের দাম বেশি ধরা হ'ত, সে ব্যবস্থাও উঠে গেছে।

আগেকার নির্বাচনপরম্পরায় স্তরের পর স্তর যে পরোক্ষ নির্বাচনের বন্দোবস্ত ছিল, এখন তা বদলে গেছে। শুধু গ্রাম বা ছোট শহরের সোভিয়েট নয়, সর্বত্রই সোজাসুজি নির্বাচন ব্যবস্থা বাহাল হয়েছে, গোপন 'ব্যালট্' ভোটের বন্দোবস্ত হয়েছে। সোভিয়েট শাসনের প্রথম কয়েক বৎসর জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা খুবই বেশি ছিল, জারের শাসনের ঐ ছিল উত্তরাধিকার। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গোপন 'ব্যালট' ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো অসুবিধার কথা রইল না। তা ছাড়া সাম্যবাদবিরোধীর সংখ্যা এখন সোভিয়েট দেশে এতই নগণ্য যে গোপন 'ব্যালট' ভোটের ব্যবস্থা কায়েম করতে কর্তৃপক্ষ সংকোচ করেনি।

কোনো কোনো সমালোচক (বিশেষত যারা ইংরেজ) এই ব'লে আনন্দ পেয়েছেন যে, বলশেভিকরা এই নতুন শাসনবিধি তৈরী ক'রে সাম্যবাদ থেকে পার্লামেণ্ট মার্কা 'লিবারল' মতবাদে ফিরে এসেছে ! কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে, ১৯০৩ সালে বলশেভিকরা ঘোষণা করেছিল যে, প্রত্যেককে ভোট দিয়ে গোপন 'ব্যালটের' ব্যবস্থা ক'রে প্রত্যক্ষ নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ স্থাপন করা তাদের উদ্দেশ্য। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের সময় এই ঘোষণাবাণীই তাদের পথ নির্দেশ করেছিল। কিন্তু বলশেভিকরা ভাববিলাস পরিহার করতে অভ্যস্ত বলে তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, তখনই সুদূরপরিব্যাপ্ত রাষ্ট্রে অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে 'ব্যালট' বাক্সের মহিমা প্রচার করা প্রয়োজন ছিল না, যুক্তিযুক্তও ছিল না। কিন্তু আঠারো বৎসর পরে অবস্থা বদলাবার পর সেই ১৯০৩ সালের ঘোষণা অনুসারেই কাজ হ'ল। জনসাধারণকে বলশেভিকরা যতটা বিশ্বাস করেছে, কোনো দেশের কোনো দল মুখের কথাতেও ততটা বিশ্বাস দেখাতে পারেনি।

নতুন কানুনে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভা হচ্ছে রাষ্ট্রের সুপ্রীম কাউন্সিল। এ কাউন্সিলের দুটো ভাগ আছে। দশ কোটী ভোটার সোজাসুজি নির্বাচন করে ইউনিয়নের কাউন্সিল। আর ইউনিয়নে যেসব রাষ্ট্র ও স্বাধীন অঞ্চল আছে, তাদের প্রতিনিধি নিয়ে জাতিসংসদ গঠন করা হয়। উভয়েরই সমান ক্ষমতা ; মতভেদ হলে উভয়ের সম্মিলিত অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে। এতেও যদি মতভেদের অবসান না ঘটে, তাহ'লে নতুন করে নির্বাচন করতে হয়। বৎসরে অন্তত দু'বার সুপ্রীম কাউন্সিল বসে ; এর মেয়াদ হচ্ছে চার বৎসর। সুপ্রীম কাউন্সিলের দুটো শাখা আছে ব'লে যেন মনে না করা হয় যে, এ হচ্ছে ইংরেজদের হাউস্ অব লর্ডস আর কমন্সের আর এক সংস্করণ। সোভিয়েট ব্যবস্থায় ঐ রকম প্রভেদ ব'লে জিনিষ নেই। তাছাড়া সর্বত্র যাকে বলা হয় 'আপার হাউস', তার আসল কাজ হচ্ছে সমাজের প্রগতিকে

রোধ করে রাখা। ফ্রান্স ও আমেরিকায় তারা যে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়, তা কেবল ধনিকদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য। সোভিয়েটে এ রকম কাণ্ডকারখানার কোনো যায়গা নেই।

সুপ্রীম কাউন্সিলের অধিবেশন যখন চলছে না, তখন দৈনন্দিন রাষ্ট্র-শাসনের কাজে কমিসারদের সাহায্য করার জন্য একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। কার্যনির্বাহকদের কোনো কাজে গলদ থাকলে বিচার করে সুপ্রীম কাউন্সিল। আমেরিকায় এ বিচার করে সুপ্রীম আদালত। কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেছে যে, সে আদালত হচ্ছে পুরোপুরি ধনিকদের হাতে। নতুন শাসন-বিধিতে বিচার বিভাগ পূর্বের তুলনায় যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তাও রাষ্ট্র-বিদদের প্রণিধানযোগ্য।

শাসনবিধির একটা পরিচ্ছেদ খুবই মূল্যবান—সেটা হচ্ছে নাগরিকের মূলগত অধিকার ও কর্তব্যের তালিকা। আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে লড়াই ক'রে স্বাধীন হয়েছিল কিম্বা ফ্রান্সে যখন বিপ্লব হয়েছিল, তখনও মানুষের অধিকার সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু দুটোতেই বলা হয়েছিল যে, ব্যক্তিগত সুখের জন্য অবাধে সম্পত্তি উপভোগের অধিকার সনাতন ও অপরিবর্তনীয়। রাজস্ব আদায় করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে ব্যক্তিস্ব সম্পত্তিতে হাত দিলে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলা হ'ত। সাধারণের কল্যাণ সম্বন্ধে বড় বড় কথা শোনা গেলেও তার চেয়ে মাত্র কয়েকজনের স্বার্থ কায়েম করা যে সমাজের প্রধান কর্তব্য, তা বেশ বোঝা যেত। সোভিয়েট শাসন চায় সর্বজনের কল্যাণ, তাই সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা সম্বন্ধে বক্তৃতা বরদাস্ত করা হয় না। সেখানকার শাসনবিধি বলে যে, কাজ দাবী করা ও পাওয়া, যে-কোনো বিষয়ে উচ্চতম শিক্ষালাভের পূর্ণ সুযোগ পাওয়া, রোগে শোকে বার্ধক্যে সমাজের কাছ থেকে প্রয়োজনমত ভাতা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ

নিয়ে প্রায় দুশো জাতি উপজাতি সোভিয়েট্‌ রাষ্ট্রে বাস করে। জাতিধর্ম্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সকলের জন্য এই ব্যবস্থা সব যমস মজুদ রাখা হয়েছে। আমাদের মতো যারা ঘনান্ধকারে পড়ে আছি, জমিদার পুঁজিদারের লাভের অঙ্ক মোটা করতে সাহায্য করাই যাদের একমাত্র কাজ, দুঃখকষ্ট যাদের চিরসাথী, অত্যাচার লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করাই যাদের ধর্ম, বড়লোক-গরীবের তফাৎ স্বয়ং ভগবান ক'রে দিয়েছেন বিশ্বাস ক'রে যারা স্বস্তি পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করি, গরীবের যে সমাজের কাছে দাবী থাকতে পারে এ যারা স্বপ্নেও ভাবতে সাহস করি না—তাদের কাছে সোভিয়েট দেশটা তাজ্জব লাগবে বই কি!

সোভিয়েট শাসনে বক্তৃতা আর প্রচারের স্বাধীনতা, সভাসমিতি শোভাযাত্রা করার স্বাধীনতা সকলে পেয়েছে। অবশ্য নামমাত্র স্বাধীনতা অন্য কতগুলো "গণতান্ত্রিক" দেশেও আছে। কিন্তু সে স্বাধীনতার সত্যই কোনো অর্থ নেই। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। এখানে কেউ কাউকে বড় হোটেলে খানা খেতে বা প্রকাণ্ড মোটর চড়ে হাওয়া খেতে বারণ করছে না। স্ফূর্তিতে থাকার "অধিকার" তো আমাদের আছে, কিন্তু ট্যাঁক যখন খালি আর তা ভারী হবার কোনো আশাও নেই, তখন ঐ "অধিকার" বা "স্বাধীনতা" একটা নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই স্টালিন একবার বলেছিলেন যে, "যতদিন শোষণপ্রথা লুপ্ত না হচ্ছে, যতদিন মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার চলতে পারছে, যতদিন দারিদ্র্য রয়েছে, বেকার সমস্যা রয়েছে, যতদিন সবাই ভয়ে কম্পমান হয়ে ভাবে যে তার কাজ গেলে খাবার জুটবে না, ঘরবাড়ী থেকে গলাধাক্কাই খেতে হবে, ততদিন 'স্বাধীনতা' কথাটার কোনো অর্থ হয় না।" যথার্থ স্বাধীনতা কেবল সাম্যবাদী সমাজেই সম্ভব। সোভিয়েটভূমিতে সেই সমাজ তৈরী হচ্ছে।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে শোনা যায়, খ্রীষ্টজন্মের সাড়ে-চারশো বৎসর আগে গ্রীস দেশের অ্যাথেন্সে তার পরাকাষ্ঠা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অ্যাথেন্সের সমাজ দাসপ্রথা না থাকলে চলত না। কাজ করত ক্রীতদাস জন্মদাসেরা; আর তাদের প্রভুরা "গণতন্ত্র" চালাত। এই ব্যবস্থাই বুর্জোয়া "গণতান্ত্রিকদের" আদর্শ!

জায়গীরদারী-জমিদারী ব্যবস্থায় সাধারণ লোকের কী অবস্থা ঘটে, তা আর আমাদের দেশের লোককে কষ্ট করে বোঝাতে হবে না। ব্যাপারটা-যে আসলে কী, তা তারা হাড়ে হাড়ে বোঝে।

ধনতন্ত্র যখন ক্রমে সারা দুনিয়া অধিকার ক'রে বসল, তখনও "স্বাধীনতা" সম্বন্ধে অনেক গালভরা বুলি আওড়ানো হচ্ছিল, কিন্তু বড়লোকদের দাবা খেলায় গরীবদের শুধু বোড়ে-হিসাবে ব্যবহার করা চলল। আজও তাই চলছে—"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়।" মতলব হাসিল করতে হলে গরীবকে খাটিয়ে নিতে হবে, আর বুঝিয়ে দিতে হবে যে বড়লোক-মহাপ্রভুদের জন্য খেটে যাওয়াই হচ্ছে ভগবানের ব্যবস্থা। ধনিক-দের অনুচর হয়ে গরীবদের ভড়কে রাখার কাজে অনেক "নেতা" অবশ্য জুটে গেলেন এবং আছেন।

গরীব যেই বুঝতে শিখল, একজোট হয়ে লড়াই করতে তৈরী হ'ল, অমনই বড়লোকের মুখোস খুলে নিজ মূর্তিতে দেখা দিলেন। একশো বৎসর আগে বিলাতের একজন মহানুভব বড়লোক—রবার্ট ওয়েন—গরীবদের হয়ে কথা বলতে গিয়ে দেখলেন যে, তাঁর বড়লোক-বন্ধুরা কিছুদিন তাঁর কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে তারপর তাঁকে "একঘরে" ক'রে দিল। এখনও যারা গরীবদের হয়ে কাজ করে, বলা হয় যে তাদের মাথা কিম্বা মতলব খারাপ। মজুর আর কিষাণ আন্দোলনকে যে এত ঝড়ঝাপটা সইতে হয়, তার কারণ এই যে, গরীবদের "অধিকার" সম্বন্ধে বড়লোকদের

একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে, তাই কাজের ক্ষেত্রে সে "অধিকার" প্রয়োগ করতে গেলেই তাদের দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা তৈরী আছে।

ধনতন্ত্রের নিপাত ঘটাতে না পারলে সর্বমানবের মঙ্গল আসবে না। মজদুর-কিষাণরা একজোট হয়ে না লড়লে ধনতন্ত্র আপনা আপনি স'রে যাবে না। কিন্তু এ কথা বলাই আমাদের সমাজে "মহাপাপ"।

সামনে পোলাও-কালিয়া-সন্দেশ-মোণ্ডা সাজিয়ে যদি কাউকে বলা হয় যে জিনিষগুলি খাওয়া ছাড়া অন্য সব অধিকারই আছে, তা হলেই ধনতন্ত্রের আমলে আমাদের "অধিকাবের" তুলনা মিলবে। যাদের খাটুনির জন্যই দুনিয়ার দৌলত মানুষের হাতে আসছে, সে দৌলতে তাদের কোনো অধিকার নেই, বড় জোর তারা একটা ভোট পেতে পারে ; কিন্তু তার বেশি কিছু চাইতে গেলেই মুস্কিল। ধনতন্ত্রের বিধান হচ্ছে এই।

ফ্যাসিষ্ট দেশগুলির তো কথাই নেই, "গণতান্ত্রিক" দেশেও জনসাধারণের অধিকার ব'লে কোনো জিনিষ থাকতে পাবে না। অবশ্য সেখানে তারা সামান্য কিছু সুবিধা পেতে পারে, কিন্তু তারা যে মুহূর্তে আসল "অধিকার" দাবী করে, তখনই মুস্কিল বাধে। ধনিক দেশে যখন কাগজে কলমে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়, তখন ধনতন্ত্র আর গণতন্ত্রের মধ্যে একটা লড়াই সর্বক্ষণই চলতে থাকে। ধনতন্ত্রের জয় হলে আসে ফ্যাশিজম্ ; গণতন্ত্রের জয় হলে আসে সাম্যবাদ। সোভিয়েট দেশে যথার্থ গণতন্ত্রের জয় হয়েছে।

সোভিয়েটের প্রশংসা শুনলে যেন অনেকেরই গায়ে জ্বর আসে। সোভিয়েট কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েও তাদের সন্দেহ যায় না ; ভাবটা প্রায় সেই পুরোণো নিন্দুকের মতো—"অমুক ডেপুটী হয়েছে ? ওঃ ! —মাইনে পাবে না।" এরা ১৯১৭ সালে বিজ্ঞের মতো বলেছিলেন যে বল-শেভিকরা গোটাকতক গুণ্ডা, দেশ শাসন ওদের কর্ম নয়। যখন দুনিয়ার বড়লোকেরা মিলে সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করছিল, তখন তারা বলতেন

যে শীঘ্রই সোভিয়েট একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা যখন প্রচার হয়, তখন তাঁরা তো প্রায় হেসে লুটিয়ে পড়েছিলেন, অর্থ-নীতি আবার অসভ্য বলশেভিকরা কী জানবে। নতুন শাসনবিধি যখন বাহাল হ'ল তখন তাঁরা আবাব বললেন, "ও সমস্ত হচ্ছে খবরেব কাগজ গবম কবাব 'প্রোপাগাণ্ডা', আসলে কিছুই হয়নি, হবেও না।" আজ আবার তাঁরা বলছেন যে চাষা-ভূষোরা আবাব জার্মানীর সঙ্গে লড়বে কি, তারা হেরে ভূত হয়ে গেছে।

নির্লজ্জ নিন্দুকরা যাই বলুক না কেন, দুনিয়ার মজ্‌দুর কিষাণ জানে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের বন্ধু, তাদের আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সহায়। তাবা জানে সোভিয়েট বাষ্ট্রেই মানুষ তাব জন্মগত অধিকাব ভোগ করতে পারে, তারা জানে যে মানুষেব কল্যাণ আনতে পারে, নতুন দুনিয়া গড়্‌তে পারে একমাত্র সাম্যবাদ আব সাম্যবাদী গণশক্তি।*

*'সোভিয়েট দেশ' (১৯৪১) প্রবন্ধ সঙ্কলন হইতে।

ইতিহাস

প্রাচীন কালে কি ঘটেছিল, তার খবর আমরা জানতে চাই কেন? দশ বছর, কি একশো বছর, কি দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে কি ছিল না ছিল, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি? ঐ সব ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট না করে আজকের পৃথিবী আর আজকের মানুষের কাজ-কর্মের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হাল হবার চেষ্টাই কি ভাল নয়?

কিন্তু এই আজকের পৃথিবীতে চারদিকে কি ঘট্‌ছে, তা ভাল করে বোঝার জন্যই আমরা প্রাচীন কালের কথা আলোচনা করি। পৃথিবীতে কিছুই অটল অচল অবস্থায় থাকে না, সর্ব্বদাই অদলবদল চলেছে। কয়েক শো কোটী বছর আগে এ পৃথিবী ছিল একটা প্রকাণ্ড আগুনের গোলার মত, সেখানে জীবন কিম্বা জীবনের সম্ভাবনা পর্যন্ত দেখা দেয়নি। বহু কোটী বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম জীবনের আবির্ভাব ঘট্‌ল। কয়েক কোটী বছর আগে এখানে প্রচুর গাছপালা আর জলে-স্থলে নানা রকমের প্রাণী দেখা গেল। আজকের পৃথিবীর সঙ্গে সেদিনের পৃথিবীর তফাৎ খুবই বেশি, কিন্তু বহু যুগ ধরে অবিরাম পরিবর্ত্তনের ফলেই আমাদের পৃথিবীর বর্তমান চেহারা প্রকাশ পেয়েছে।

এই যে যুগ যুগ ধরে পরিবর্তন ঘটে আস্‌ছে, তা হঠাৎ দৈবক্রমে হচ্ছে না, একটা নিয়মিত বিধান অনুসারেই হচ্ছে। আমরা যদি শুধু আজকের জীবন নিয়ে আলোচনা করি তো সেই বিধানের সন্ধান মিলবে না। তাই দেখা যায় যে, যতদিন পৃথিবীর আদিযুগের খবর কেউ খুঁজ্‌ত না, যতদিন কোটী কোটী বছর পূর্বে যে সব প্রাণী ও গাছগাছড়া পৃথিবীতে ছিল তাদের দেহাবশেষ ভূগর্ভ থেকে বার করা হয় নি, ততদিন পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতেন

যে দুনিয়া একদিন হঠাৎ সৃষ্টি হয়েছিল আর গোড়া থেকেই তার চেহারা আজ্‌কের মতই ছিল। মাত্র কয়েক শো বছর আগে যে দু'একজন বৈজ্ঞানিক এই ভ্রান্তি খণ্ডন করছিলেন, তাঁদের সকলেই বিদ্রূপ করত। কিন্তু যে কথা আজ স্বতঃসিদ্ধ, বহুকাল ধরে ক্রমশ যে পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে, এই কথাই তখন বৈজ্ঞানিকেরা বলে হাস্যাস্পদ হতেন।

পৃথিবীসৃষ্টি সম্বন্ধে বহু রূপকথা সে-দিন পর্যন্ত চলিত ছিল। এই সৃষ্টি-কার্য নাকি সাত দিন ধরে চলেছিল, একজন পণ্ডিতধুরন্ধর পাদরী সাহেব প্রচার করতেন—আর সবাই বিশ্বাস করত—যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সনে একদিন হঠাৎ সকাল ৯ টায় ভগবান জগৎ সৃষ্টি করে বসেন। আজ বৈজ্ঞানিক দূরে থাক্, সামান্য শিক্ষা যিনি পেয়েছেন, তিনিও এমন কথাকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেবেন। যুগ যুগ ধরে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে যে কত রূপান্তর ঘটেছে, তা বই পড়ে তো বোঝা যাবে নিশ্চয়, যাঁরা শহরে আছেন তাঁরা যে কোন দিন যাদুঘরে গেলেই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবেন। পৃথিবীতে আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অদলবদল ঘটে চলেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। এই হচ্ছে প্রকৃতির বিধান।

কিন্তু পণ্ডিত আর অপণ্ডিত সকলেই যে বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী হচ্ছে অপরিবর্তনীয় আর হঠাৎ এক মুহূর্তে তার সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ শুধু জ্ঞানের অভাব নয়। যাঁরা প্রভাব প্রতিপত্তি ভোগ করতেন, তাঁদের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত খুবই মনঃপূত ছিল। পৃথিবী যদি নিত্য, সনাতন, অপরিবর্তনশীল হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের সমাজও নিশ্চয়ই সেইরূপ। সুতরাং সমাজব্যবস্থা চিরন্তন—আজ যে ব্যবস্থা চলছে, আগেও তাই ছিল, ভবিষ্যতেও থাক্‌বে, মূলগত কোন পরিবর্তন ঘটে নি, ঘট্‌বে না। এই কথাই আগে সকলকে শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু সমাজ আজ যেমন আছে, পরেও তেমনি থাকবে, এ বিশ্বাস সকলের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? প্রয়োজন

ছিল এই যে, পৃথিবীর ঐশ্বর্য যারা ভোগ করছিল, সমাজে সম্মান যারা পাচ্ছিল, তাদের পক্ষে এ বিশ্বাস খুবই লাভজনক ছিল। যাদের অর্থ ছিল, ক্ষমতা ছিল, তারা মনে করত যে, চিরকালই তারা সমাজের শীর্ষস্থানে থাকবে, আর সাধারণ লোক—গরীব মজুর, কিষাণ প্রভৃতি সবাই চিরকাল তাদের আনুগত্য করবে, সমাজপতিদের সুবিধার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করবে। তাই তারা নিজেদের ঐ কথা বোঝাত, আর বিশেষ করে তাদের তাঁবেদার মজুর কিষাণদের বুঝিয়ে দিত যে, এই সনাতন ব্যবস্থা শুধু-যে সব চেয়ে ভাল তা নয়, এ ছাড়া অন্য উপায়ও থাকতে পারে না।

ভূতত্ত্ব ও প্রাণিবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে হঠাৎ একদিন চিরন্তন পৃথিবী সৃষ্টির রূপকথা ভেঙে গেছে। আর যে-রূপকথায় বলে যে সমাজ আজ যেমন আছে, আগেও তেমনই ছিল, পরেও তাই থাকবে, সে রূপকথার বিনাশ ঘটাচ্ছে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব। মানুষ আর মানুষের সমাজ বদ্‌লে আস্‌ছে, বদ্‌লে চল্‌বে—এই হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম। এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়, আর এক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, নতুন ব্যবস্থার স্ফুরণ ঘটে—এই ভাঙাগড়ার ইতিহাসই আমরা দেখতে পাই। এই চিরপরিবর্তনশীলতার যে শেষ হবে, তার কোন লক্ষণ আমরা দেখি না, ভাব্‌তেও পারি না। কিন্তু কয়েক দশক বা শতকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে,—গভীর অভিনিবেশ করতে পারলে সে বিধানও আমাদের অজানা থাকে না। ভবিষ্যতে কয়েক হাজার বছরে মানব-সমাজ কি রূপ গ্রহণ করবে, তা আমরা স্পষ্ট দেখ্‌তে না পেলেও সমাজের বিকাশ কোন পথ দিয়ে হবে সে বিষয়ে একটা ধারণা করতে পারি। এ জ্ঞানের গুরুত্ব হচ্ছে এই যে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি থাকলে ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়—পরে কি ঘটবে, পূর্ব থেকে তার আভাষ থাকলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য তৈরী থাকতে পারি, অনেক বিপদ এড়িয়ে যেতে পারি, অনেক সুযোগের

সদ্ব্যবহার করতে পারি। অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান হচ্ছে ভবিষ্যৎকে আয়ত্ত করার প্রকৃষ্ট উপায়।

কিন্তু সমাজের রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে শুধু যে বহুকালের ক্রমানুক্রমিক ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে, তা নয়। কেবল সুপ্রাচীন যুগের খবর নিয়ে যে আলোচনা সর্বদাই আরম্ভ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। এমন কি, অনেক সময় ঐ পরিবর্তনের বিধান ভাল করে বুঝতে হলে আজকের অবস্থা আলোচনা করে অতীতের কথা পড়তে হবে। এর একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

আজ সারা দুনিয়াতে ইন্‌কিলাব চলেছে, শ্রমিকরা ধনিকদের আধিপত্য ভাঙ্‌তে চাইছে—যারা গরীবের খাটুনির জোরে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করেছে, গরীবদের যথাসম্ভব বেশী খাটিয়ে আর যথাসম্ভব কম মজুরী দিয়ে মোটা মুনাফা আত্মসাৎ করে, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এখন প্রশ্ন উঠে—এই শোষণব্যবস্থা কি শুধু বর্তমান যুগের বিশেষত্ব, না কোন না কোন রূপে সকল যুগেই এ জিনিষ ছিল? ইতিহাস বলে যে সকল যুগেই গরীবের উপর অত্যাচার চলে এসেছে। কারখানা, ব্যাঙ্ক, রেল কোম্পানী ইত্যাদি নিয়ে পুঁজিদারী ব্যবস্থা জেঁকে বসার আগে ছিল জায়গীরদারী আর জমিদারী; কিষাণদের বঞ্চিত করে দেশের মাটীর ঐশ্বর্য জমিদার একচেটিয়া করে রাখ্‌ত। আবার প্রশ্ন উঠ্‌বে—ধনিক যুগ আসার পূর্বে দুর্গত কিষাণরা কি বিপ্লব করত না, অত্যাচারীকে যথাযোগ্য শিক্ষা দেবার চেষ্টা করত না? ইতিহাস বলে যে তারা কখনও কখনও করত বটে, কিন্তু প্রত্যেক বারই বড়লোকদের কাছে হার মান্‌তে বাধ্য হত, কৃষক-বিদ্রোহ নৃশংস উপায়ে দমন করা হত। বার বার পরাজয়ের কারণ হচ্ছে এই যে, কেবল কিষাণরা একজোট হয়ে এক মতলব নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। তারা নিজের নিজের সামান্য জমি চাষ করে, কদাচ কখনও পরস্পরকে সাহায্য করার দরকার পড়ে, শস্য বিক্রয়ে র

সময় তারা হয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বাজারে শাকসব্‌জি, চালডাল, গম ইত্যাদির সরবরাহ কম হলে দাম চড়ে, চাষী বেশী লাভে বিক্রয় করতে পারে। আর সরবরাহ বেশী হলে দাম পড়ে যায়, চাষীর লাভও কমে। সুতরাং চাষীদের পক্ষে বোঝা শক্ত যে তাদের সকলেরই স্বার্থ এক; একজোট হয়ে কাজ করার প্রবৃত্তি তাদের সহজে আসে না। অন্যদিকে মজ্‌দুররা কারখানায় একত্র কাজ করে, পাশাপাশি থেকে পরস্পরকে সাহায্য করে। একজন মজ্‌দুর একলা কোন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে না; অন্য সহকর্ম্মীদের উপর তাকে নির্ভর করতেই হয়। তাই তাদের পক্ষে একজোট হওয়া শক্ত নয়; চাষীদের চেয়ে ঢের সহজে তারা একত্র হয়, ইউনিয়ন খাড়া করে, পরস্পরের স্বার্থ যে এক তা বুঝতে পারে। ইতিহাসে তাই কৃষকবিদ্রোহের দৃষ্টান্ত অনেক হলেও বহুদিন ধরে একজোট হয়ে লড়াই করা তাদের পক্ষে সহজ নয় বলে সাফল্যের দৃষ্টান্ত বিরল। চাষীরা যখন মজদুরদের সহযোগিতা করে, তখনই বিপ্লবের জয় সম্ভব হয়। গরীব চাষীদের সাহায্য নিয়ে রুষদেশের মজদুররা তাই সেখানে বিপ্লব ঘটিয়ে নিজেদের শাসন কায়েম করতে পেরেছে।

তাহ'লে দেখা যায় যে আজকের ঘটনা থেকে আমরা ইতিহাসে পরিবর্ত্তন কি ভাবে হয়ে থাকে তা কিছু বুঝতে পারি। ইতিহাসে মৌলিক পরিবর্ত্তন তখনই ঘটে যখন সমস্বার্থ বহু লোক সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে। ইতিহাসে পরিবর্ত্তন ঘটার অর্থ হচ্ছে সমাজের রূপান্তর। যে শ্রেণীর উদ্যোগে ও উদ্যমে পরিবর্ত্তন ঘটে, সমাজের নতুন রূপের উপর সে শ্রেণীর চিহ্ন থেকে যায়। তাই যখন জনসাধারণ বল্‌লে বোঝাত চাষীর দল, তখন ইতিহাস ছিল একরকম। আর আজ যখন মজদুররা গণআন্দোলনে এগিয়ে এসে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত লড়াই চালাবার ক্ষমতা দেখাচ্ছে, তখন ইতিহাসের চেহারা হবে আর এক রকম।

আগে উৎপাদন শুধু কৃষকশ্রেণী করত কেন, তা বোঝার চেষ্টা করা যাক্‌। তখন প্রত্যেকে নিজের জমি চাষ করে নানারকম শস্য উৎপাদন করত, আর

তাঁতি, মুচি প্রভৃতি সবাই বাড়ী বসে কাজ করত। আজ অবশ্য দেখি বিরাট জুতোর কারখানা, আর কাপড়চোপড়ের বড় বড় কারখানা আর দোকান। এই তফাতের কারণ হচ্ছে যে আগে মানুষকে সব জিনিষই নিজের হাতে তৈরী করতে হত, কলকজার রেওয়াজ তখনও হয় নি। প্রায় দুশো বছর আগে থেকে যন্ত্রের প্রচলন সুরু হয়েছে, আর তার ফলে সত্যই হয়েছে এক বিরাট সমাজবিপ্লব।

প্রত্যেক লোক নিজের বাড়ীতে কলকজা বসাতে পারে না বলে একা কাজ করে মাল বেচে দিন গুজরাণ করা শক্ত হয়ে উঠ্‌ল। তাই যেখানে কল বস্‌ল, কারখানা ফাঁদা হল, সেখানে সবাই এসে জড় হতে লাগ্‌ল। কলের যারা মালিক তারা বেকার গরীবদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে দাঁড়াল। গরীবকে কলে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হল, কিন্তু পারিশ্রমিক যা দেওয়া হল তাতে কোনক্রমে বেঁচে থাকা মাত্র সম্ভব। উৎপাদনের ফলে যে মোটা মুনাফা হল, তা পুঁজিদার আত্মসাৎ করতে লাগ্‌ল।

এই ব্যবস্থাতে একটা নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হল—যারা নিজের বাড়ীতে কাজ না করে মালিকের কারখানায় খাট্‌ত, যারা আর নিজের হাত না চালিয়ে অপরের কলকজা চালাত। এইভাবে সর্বহারা 'প্রলেটেরিয়ট' শ্রেণীর উদ্ভব হল। আজ সারা দুনিয়াতে এদের দেখা যাবে, সমাজবিপ্লব আন্‌বার জন্য এদের ব্যগ্রতা লক্ষ্য করা যাবে।

তা হলে আমরা দেখলাম যে উৎপাদন যে ভাবে চলে সেই ভাবে সমাজে নতুন শ্রেণী গজিয়ে উঠে। আগে উৎপাদন হত কম, প্রত্যেকে নিজের জন্য ঘরে বসে খাট্‌ত, তার ফলে সমাজের রূপ হল একরকম। পরে বহু লোক একত্র হয়ে অল্প কয়েকজন মালিকের কারখানায় কাজ করতে লাগ্‌ল, আর সমাজের রূপ হল আর এক রকম। সমাজে অদলবদলের কারণ হচ্ছে উৎপাদনপদ্ধতির পরিবর্তন অর্থনৈতিক পরিবর্তন।

কিন্তু মানুষ উৎপাদনে লাগে কেন? এর উত্তর পেতে দেরী হবে না, কারণ মানুষকে বাঁচতে হলে যা দরকার তা তৈরী করতেই হবে। মানুষ কাজ করে ক্ষুধা তৃষ্ণার হাত থেকে বাঁচার জন্য, পরণের কাপড় আর মাথা গুঁজবার মত যায়গা যোগাড় করার জন্য। ইতিহাসের অর্থ হচ্ছে মানুষ কি ভাবে থেকেছে তার বিবরণ, আর মানুষ যা কিছু করেছে, তার মূলে আছে বেঁচে থাকার প্রয়োজন। বাঁচবার জন্য কাজকর্ম হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতি, আর সে পদ্ধতির পরিবর্তনই হচ্ছে বিপ্লব, হচ্ছে ইতিহাসের অধ্যায় ভেদ। একেই বলা হয় ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা।

ধনকিরা যখন শিক্ষাব্যবস্থার মালিক, পুঁজিদার জমিদাররা যখন সমাজ-পতি, তখন ইতিহাসের এ ব্যাখ্যাকে অবহেলা করে সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলা হয়। তাই আমরা শুনি যে মানুষের মনে কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে পরিবর্তন আসার ফলেই সমাজে পরিবর্তন ঘটে। বলা হয় যে পূর্বে লোকে সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করত না, যার যেমন অবস্থা তেমনই থাকৃত, বড়লোকদের বশ্যতা স্বীকার করত। সুতরাং তখন কোন বিপ্লব ঘটত না। পরে কয়েকজন সমাজ-ব্যবস্থাকে সমালোচনা করতে আরম্ভ করল, নিন্দা করতে লাগ্‌ল, আর সাধারণ লোক তাদের কথা শুনে দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগাল। বিপ্লবের যুগ সুরু হল।

এ ধারণা যে ভুল তা বোঝা খুবই সহজ। যদি পুঁজিদাররা গরীব মজুরদের যথাসম্ভব কম টাকা দিয়ে বেশী খাটিয়ে নিজেদের পকেট ভারী না করত, তাহলে কি তারা পুঁজিদারদের বিরুদ্ধে কোন কথা শুন্‌তে রাজী হত? যার তার কথায় তারা মনিবের বিরুদ্ধে জেগে উঠ্‌ত কেন? আর শুধু আন্দোলনে কি কখনও বিপ্লব হয়? শুধু বক্তৃতা দিয়ে আর প্রবন্ধ লিখে যদি বিপ্লব করা যেত, তাহলে শ্রমিকদের না জাগিয়ে ধনিক শ্রেণীকে দিয়েই তো কিছু করা চলে? যারা শিক্ষিত, তারা বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মর্ম বোঝে

—সুতরাং শিক্ষিতদের মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে তাদের নিয়ে বিপ্লব করা যায় না কেন? যারা সব চেয়ে গরীব, সব চেয়ে অশিক্ষিত, তাদের কানেই বিপ্লবের সুর পৌঁছে দেওয়া সহজ কেন, আর শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বত্র বিপ্লবের বিরোধেই বা কেন? এর কারণ হচ্ছে যে বিপ্লব আন্দোলন ধনিকদের মনঃপূত হতে পাবে না, বরং তাদের স্বার্থে বেজায় আঘাত করে থাকে। অপরের উপর প্রভুত্ব উপভোগ করে ভালো থাওয়া-দাওয়া আর সুন্দর বাড়ীতে থাকার অধিকার বজায় রাখার জন্য তারা বিপ্লবীদের কাছে হার মানবার চেয়ে তাদের ফাঁসিকাঠে চড়িয়ে বা গুলি করে মারতে চাইবে। শ্রমিকরা যদি সভ্য ভাবে বেঁচে থাকার দাবী নিয়ে লড়াই করে তো তাদের সঙ্গে মালিকদেব ঝগড়া কথনও মিট্‌বে না।

তাই আমরা দেখি যে ইতিহাসে গুরুতর পরিবর্তন আনে শ্রেণীসংগ্রাম—শোষক, অত্যাচারী জমিদার পুঁজিদারের বিরুদ্ধে শোষিত, অত্যাচারিত চাষীমজুরদের সংগ্রাম। এ সংগ্রামের মূলগত কারণ হচ্ছে এই যে মানুষের সব চেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে থাওয়া পরাব ব্যবস্থা আর মাথা গুঁজে থাকার যায়গা। এ অভাবগুলো পূরণ না করে উপায় নেই। তাই সাম্যবাদীরা বলে যে, সকলের দরকারমত এই সব জরুরী জিনিষ সবাইকে ভাগ করে দেবার ব্যবস্থা চাই।

আমরা দেখছি যে বর্তমান কালের সমস্যা বুঝতে হলে প্রাচীন কালের খবর রাখা দরকার, কিন্তু আবার প্রাচীন কালের ব্যাপার বুঝতে এখনকার খবর জানাও দরকাব। কিন্তু সামান্য কিছু কালের খবর যোগাড় করলেই চলে না। আমাদের চারদিকে কি ঘটছে, আমরা যদি শুধু তাই জেনে সন্তুষ্ট থাকি, তাহলে অনেক কিছু ব্যাপারই আমরা বুঝতে পারব না। আমাদের দৃষ্টি আরও ব্যাপক না হলে আমরা ইতিহাসে শ্রেণীর বদলে শুধু কয়েক জন ব্যক্তিকে দেখ্‌ব। মনে করব যে কয়েকজন লোকের কার্যকলাপই হচ্ছে

ইতিহাস। ইতিহাসের গতি বুঝ্‌তে হলে আমাদের দৈনন্দিন ঘটনা থেকে একটু সরে গিয়ে বাইরে থেকে তার তাৎপর্য বিবেচনা করতে হবে।

মানবসমাজের ক্রমবিকাশের বিবরণ হচ্ছে ইতিহাস। এই বিকাশের বর্তমান সীমা নির্দেশ করছে সাম্যবাদী সমাজ—যে সমাজে ভূমি ও ভূমিজসম্পদ, শিল্প-সম্পদ প্রভৃতি যারা কাজ করে, সমাজশরীরে আগাছার মত থাকে না, তাদেরই সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু সাম্যবাদেই যে মানুষের ইতিহাস শেষ হচ্ছে তা নয়। সাম্যবাদী সমাজের বিকাশ কি ভাবে হবে, তারপর সমাজের চেহারা কি ধরণের হবে, সে খবর এখনও আমাদের কাছ থেকে গোপন রয়েছে। যখন মানবসমাজের গতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও স্পষ্ট হবে, তখন আমরা হয়তো কয়েক বৎসরের নয়, হাজার হাজার বৎসর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব। কিন্তু এখনও অত বেশী দূরের খবর আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। তার চেয়ে অতীত ও বর্তমান নিয়ে আলোচনাই বেশী যুক্তি-যুক্ত।

আমরা দেখেছি যে অর্থনৈতিক অদলবদলের সঙ্গে মানুষের ইতিহাস বদ্‌লে এসেছে। সুতরাং কোনো এক দেশের ইতিহাস বুঝতে হলে সে দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টন সম্বন্ধে খবর বিশেষ দরকার। আমরা তাই দেখি, যে-সব দেশে শীত বা গ্রীষ্ম মারাত্মক রকম অতিরিক্ত নয়, সেখানেই সভ্যতা বিকাশ পেয়েছে। অধিকাংশ আদিম জাতি থাকে এমন সব দেশে যেখানে অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডার দরুণ উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটানো প্রায় অসম্ভব। এস্কিমো বা মধ্য আফ্রিকার বামনদের কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখানো যায়।

দক্ষিণ আমেরিকায় ইঙ্কারা প্রায় বিষুবরেখার উপর থেকেও যে সভ্যতায় অগ্রসর হতে পেরেছিল, তার কারণ এই যে তারা পাহাড়ে যায়গায় থাক্‌ত, সেখানে গরম অপেক্ষাকৃত কম।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া ছাড়া অন্য ভাবেও উৎপাদনপদ্ধতির উপর প্রভাব পড়ে। ইয়োরোপ ও এশিয়ার সুদূর উত্তরে বল্‌গা হরিণ হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে হিতকারী প্রাণী। তার মাংস সবাই খায়, তার চামড়া থেকে কাপড় আর তার শিং থেকে হাতিয়ার তৈরী হয়। এই বল্‌গা হরিণদের মধ্যে মড়ক উপস্থিত হলে অনেক পরিবার, এমন কি সারা জাতকে অনাহারে ভুগতে হয়। শুধু যে অসভ্যদের মধ্যে এরকম ব্যাপার দেখা যায়, তা নয়। সার্ডিন্ মাছ ধরতে না পারলে অতলান্তিক মহাসাগরের ধারে যে-সব সভ্য ফরাসী বাস করে, তাদের মহা মুস্কিল। কোন কোন বৎসর সার্ডিন্ মাছ দেখা দেয় না। আর তখন, অন্য দেশে শস্য না ফল্‌লে চাষীদের যে-অবস্থা হয়, তেমনই বিপদে ফরাসী জেলেরা পড়ে।

কিন্তু আমরা যেন মনে না করি যে, প্রাকৃতিক আবেষ্টনের দরুণ মানুষের জীবন চিরকাল একই ভাবে প্রভাবিত হয়ে এসেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেমন বদ্‌লাচ্ছে, মানুষের সমাজ তেমনই বদ্‌লে চলেছে। রুষদেশের আদিম অধিবাসীরা লোহার ব্যবহার জান্‌ত না বলে তাদের কাছে বনজঙ্গল ছিল একটা অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক। বড় বড় গাছ কেটে জঙ্গল সাফ করা তাদের পক্ষে বেজায় শক্ত ছিল। তাই জঙ্গল পার হয়ে যাওয়া সকলে একটা খুব স্মরণীয় ব্যাপার মনে করত; জঙ্গল ছিল সব রকম ভূতপ্রেত ভর্তি একটা ভয়ঙ্কর যায়গা। সুতরাং তখনকার লোক জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে জঙ্গল আর অনুর্বর প্রান্তরের মাঝখানে বাসের চেষ্টা করত। তারপর শ্লাভ্‌রা এসে সেখানে বাস আরম্ভ করল। তারা লোহার কুঠার ব্যবহার করতে জান্‌ত। সুতরাং গভীর জঙ্গলে ঢুকে গাছ কেটে গ্রাম স্থাপন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। জঙ্গলই ছিল শ্লাভদের অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদ। তারা বনের মধু সংগ্রহ করত, মাংস আর চামড়ার জন্য বনে শিকার করত, জঙ্গল সাফ করে চাষের ব্যবস্থা করত। গাছপালা কেটে

পুড়িয়ে যে ছাই হত, তাতে মাটীর উর্বরতা বাড়ানো যেত, শস্যও ভাল ফলত। উৎপাদনপদ্ধতির সঙ্গে বনজঙ্গলের নিকট সম্পর্ক ছিল।

জীবনযাত্রার ধরণে পরিবর্তন এলে মানুষের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক আবেষ্টনের যে সম্পর্ক, তাও যে বদলে যায় এ হচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত। আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রথম যখন ইয়োরোপীয়নরা আমেরিকায় গেল, তখন সেখানকার লোক শুধু শিকার করে জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করত। বনে জঙ্গলে ঘুরে বুনো জানোয়ার মারা ছাড়া তাদের জীবিকা অর্জনের অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ইয়োরোপীয়নরা আসার দুশো বৎসর পরে সে দেশ পৃথিবীর সভ্যতম দেশের মধ্যে অন্যতম হল; চাষবাস, কারখানা, রেলওয়ে ইত্যাদির সুব্যবস্থা ঘট্‌ল। আজ উৎপাদন পদ্ধতির দিক থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সব দেশের সেরা।

উত্তর আফ্রিকার বিরাট সাহারা মরুভূমিতে যতদিন শুধু যাযাবর আরবরা ছিল, ততদিন সেখানে চাষবাস একরকম অসম্ভব ছিল, কেবল সামান্য কয়েক যায়গায় মরুদ্যানে জলের সন্ধান মিল্‌ত। ফরাসীরা সেখানে তাদের উন্নত কলাকৌশল নিয়ে এল, আর মাটী কেটে দেখ্‌ল যে অনেকটা নীচে নেমে গেলে সাহারা মরুভূমিতেও জল মেলে। জল পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে গভীর কুয়ো খনন করার ব্যবস্থা দরকার ছিল। ঐভাবে জল তুলে কৃত্রিম উপায়ে সেচনের বন্দোবস্ত করে মরুদ্যান সৃষ্টি করা সম্ভব হল। আর সেখানে আরব দেশের প্রধান খাদ্য খেজুর যথেষ্ট উৎপাদন হতে লাগল। সুতরাং ইয়োরোপের উন্নত উৎপাদনপদ্ধতি প্রচলনের ফলে মরুভূমিতে যে কোন কালে কিছু ফলতে পারে কেউ ভাব্‌তে পারত না, তারও চেহারা বদ্‌লানো গেল।

বিজ্ঞানের বলে শুধু যে অনুর্বর মরুভূমিতে গাছপালা গজানো চলে, তা নয়; একেবারে নতুন শাকসব্জী জন্মানোও সম্ভব হয়েছে। আমেরিকান

বৈজ্ঞানিক বারব্যাঙ্ক্ এক নতুন রকম আখরোট প্রবর্তন করেছেন যা চৌদ্দ বৎসরে সম্পূর্ণ বড় হয়ে ওঠে, অথচ সাধারণত আটাশ বৎসরের কম আখরোট গাছ বড় হয় না। তিনি এমন এক জাম বার করেছেন যার ভিতর কোন বীচি নেই। এসব ব্যাপার বহুদিন ধরে চেষ্টার ফলে হয় নি, মাত্র একজন বৈজ্ঞানিক আজকের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করে এত উন্নতি আনতে পেরেছেন।

সুতরাং বলতে হবে যদিও মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকে আর যদিও তার অগ্রগতি অনেকটা নির্ভর করে প্রাকৃতিক আবেষ্টনের উপর, তবু মানুষ প্রকৃতির দাস একেবারেই নয়। মানুষেই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে বলে প্রকৃতিকে মানুষেব অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বনিয়াদ বলা ঠিক্ নয়। মানুষের কাজের উপাদান হচ্ছে প্রাকৃতিক আবেষ্টন। মানুষের জীবনব্যবস্থার গোড়ায় রয়েছে মানুষের শ্রম। সে শ্রম যতই উন্নত স্তরের হয়, যতই মানুষের কৌশল ও অভিনিবেশ বেড়ে চলে, ততই মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কম। আমরা সহজেই মনে করতে পারি যে বিজ্ঞান কৌশল যতই বেড়ে চল্‌বে, ততই প্রকৃতি মানুষের হাতে ভেঙে গড়বার মোমের মত হয়ে দাঁড়াবে।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, সমাজের শ্রেণীবিভাগের দরুণ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের উপর কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কি না। ঐ প্রভাব খুবই বেশি। শ্রেণীবিভাগের উপর বিজ্ঞান প্রয়োগ কৌশলের বিকাশ হবে কি না, তা নির্ভর করে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। আমরা সাধারণত শুনি যে ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাষ্পযান আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু দু'হাজার বৎসর পূর্বেও বাষ্প বিষয়ে পণ্ডিতদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তখন সমাজে দাসপ্রথা চলিত থাকার দরুণ মালিকদের তাঁবে বহু লোক ছিল, যাদের মাংসপেশীই কলের

কাজ করত। তাই তখনকার বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত বাষ্পযানের কোন কদর হয়নি।

এর অনেক পরে সপ্তদশ শতকে ফরাসী দেশে ঐ আবিষ্কারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু ফ্রান্সে তখন উৎপাদনপদ্ধতির পরিধি ছিল খুবই ছোট; নিজের বাড়ীতে ছোট্ট কারখানা ঘরে কারিগর কাজ করত। বাষ্পযানের তখনও কোন প্রয়োজন ছিল না। নতুন আবিষ্কারের দিকে কারুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল না, অবহেলা পেয়ে আবিষ্কারও চাপা পড়ে গেল। কিন্তু তার পঞ্চাশ বৎসর পরে ইংলণ্ডে দেখা গেল যে, লোভী জমিদাররা চাষীদের জমি কেড়ে নেওয়ার ফলে বহু লোক শ্রমিক হয়ে কাজ খুঁজ্‌ছিল, নানা দেশে সাম্রাজ্য ফেঁদে সেখানকার টাকা আর কাঁচামাল সওদাগররা দেশে নিয়ে আস্‌ছিল। সুতরাং বড় বড় কারখানা বসানো দরকার হল, সম্ভব হল—আর তৃতীয় বার আবিষ্কৃত হয়ে বাষ্পযন্ত্রের আদর হল, দারুণ সাফল্য ঘটল।

কিন্তু আমরা যেন মনে না করি যে, বণিক ব্যবস্থায় শিল্পকৌশলের অবাধ উন্নতি হয়ে থাকে। উন্নতি দূরে থাক্, পুঁজিদারদের গাঁটকাটা রেষারেষির দরুণ কিছুকাল থেকে তারা একচেটে ব্যবসার চেষ্টা করছে, আর তাতে প্রাচীন দাসপ্রথা কণ্টকিত সমাজের মত এখনও শিল্পকৌশল অবনতির দিকে যাচ্ছে। অনেকেই জানেন না যে, বাষ্পযন্ত্র আর মোটর-গাড়ী প্রায় একই সময় আবিষ্কৃত হয়েছিল। লণ্ডনে বাষ্পচালিত মোটর-বাসের প্রবর্তন হয়েছিল একশো বৎসর আগে, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীর মালিকরা বিষম ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে প্রচার আরম্ভ করল যে, রেল লাইন না পেতে রাস্তার উপর দিয়ে জোরে গাড়ী চালানো "অসম্ভব"! এ হচ্ছে একটা নতুন রকম ডাকাতি— এতে সবায়ের সর্বনাশ হবে! মোটরবাসের দারুণ নিন্দা চল্‌তে লাগ্‌ল। তখনও রবারের টায়ার হয় নি, লোহার টায়ারে রাস্তা খারাপ হয়ে যাবে বলা

হল। তা ছাড়া রাস্তায় ঘোড়া ভয় পেয়ে ক্ষেপে উঠ্‌বে, ইত্যাদি সব যুক্তিতর্ক চল্‌তে লাগ্‌ল। গোদের উপর বিষফোড়া হল এই যে, প্রত্যেক বাস থেকে একশো গজ দূরে একজন নিশান উড়িয়ে সবাইকে ঐ ভয়ঙ্কর যন্ত্রের আগমন সম্বন্ধে সাবধান করতে করতে যাবে। এতে তারা কত জোরে যেতে পারত, তা সহজেই বোঝা যায়।

এই ভাবে প্রথম মোটর-গাড়ীকে রাস্তা থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করা হয়েছিল। প্রায় ৭০ বৎসর পরে তেল আর পেট্রোলে মোটর চালাবার ব্যবস্থা হল, ঘোড়ার বদলে মোটর চালানোর লাভ বেশি হতে লাগ্‌ল (ঘোড়ার গাড়ীর চেয়ে বার্লিনে এখন ট্যাক্সির ভাড়া কম)। তখন আবার মোটর গাড়ীর কদর হল। তখন রেলওয়েরও এত উন্নতি হয়েছিল যে মোটর গাড়ীকে ভয় করার কোন কারণ ছিল না।

তাই দেখি যে, রেষারেষি আর মোটা মুনাফার খোঁজে পুঁজিদাররা আগেকার ক্রীতদাস-প্রভুদের মতই শিল্পকৌশলের অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছে।

শ্রমিকদের হাতে দেশ শাসনের ক্ষমতা যখন যাবে, তখনই মুনাফার লোভ আর টিক্‌বে না, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে কোন প্রতিবন্ধকও থাক্‌বে না। রুষদেশে যতদিন পুঁজিদাররা মালিক ছিল, ততদিন চাষবাস চল্‌ত আদিম মানুষ যে উপায়ে করত, সেই ভাবে; কয়েকটি শিল্পে টাকা ফেল্‌লে মোটা মুনাফা মিল্‌ত বলে কৃষির দিকে কেউ ফিরে দেখ্‌ত না। মজদুর কিষাণদের একাধিপত্য বহাল হবার পর থেকে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্যোগে কৃষিসংগঠন এমন ভাবে হয়েছে যাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আজ রুষদেশের কাছে হার মেনেছে। একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজেই মানুষ এমন সুযোগ পাবে যাতে প্রকৃতির পরাভব ঘটিয়ে সভ্যতা বহুদূর অগ্রসর হয়ে যাবে।*

---

* সোভিয়েট ঐতিহাসিক এম্‌, এন্‌, পক্রভস্কির প্রবন্ধের অনুবাদ।